তিনটি মতবাদ

তাক্বলীদ | ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ | ধর্মই রাজনীতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

তিনটি মতবাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তিনটি মতবাদ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ২২

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

النظريات الثلاثة (التقليد الأعمى والعلمانية والدين هو السياسة)

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

জানুয়ারী ১৯৮৭, যুবসংঘ প্রকাশনী।

২য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১০ হা.ফা.বা. প্রকাশনা

ছফর ১৪৩১ হি./মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৬ বাং।

৩য় সংস্করণ : রামাযান ১৪৪১ হি./বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/মে ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

TINTI MOTOBAD by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

তিনটি মতবাদ

(النظريات الثلاثة)

[১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর বুধবার সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনের প্রথম দিনে ছাত্র-শিক্ষক-ওলামায়ে কেরাম ও সুধী সমাবেশে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন, তার প্রশ্নোত্তর পর্বটি 'পরিশিষ্ট' অংশ হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। উল্লেখ্য যে, মূল ভাষণটি 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামে ইতিপূর্বে প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। -প্রকাশক]

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পূর্বোক্ত[১] তিন দফা কর্মপন্থা বাস্তবায়নের পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই পুরাতন ও আধুনিক কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীর আরবীয় সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯০খৃ.) তাঁর 'মাসায়েলুল জাহেলিইয়াহ' বইয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর আগমনের প্রাক্কালে আরবে প্রচলিত একশত প্রকার জাহেলিয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] আমরা সেখান থেকে একটি এবং আধুনিক কালের দু'টি পরস্পর বিরোধী চরমপন্থী মতবাদের উল্লেখ করব।

---

১. উক্ত তিন দফা কর্মপন্থা 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামে প্রকাশিত বইয়ে দেখুন। হা.ফা.বা প্রকাশনা-২৭। *-প্রকাশক*

২. বইটি লেখক কর্তৃক অনূদিত এবং সঊদী সরকার কর্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

১ম মতবাদ : তাক্বলীদ

(النظرية الأولى : التقليد الأعمى)

নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এর ফলে মানুষ আর একজন মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ে। অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। এমনকি তার যে কোন ভুল হ'তে পারে এই ধারণাটুকুও অনেক সময় ভক্তের মধ্যে লোপ পায়। মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতার অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক নবীকেই স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'র সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে সমাজের লালিত সত্যের (?) বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে কখনো তাঁদের মার খেতে হয়েছে, কখনো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কখনো দেশ ছাড়তে হয়েছে, কখনো জীবন দিতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ *('আলাইহিস সালাম)* যখন তাঁর কওমকে আল্লাহ্র ইবাদত ও নবীর এত্বা'আত বা অনুসরণের আহ্বান জানালেন, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল এবং যাতে তারা তাদের অনুসরণীয় ধর্মনেতা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব, নাস্র প্রমুখের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, তজ্জন্য যিদ করল *(নূহ ৭১/২৩)*। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পরম ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি নবীর আহ্বানে সাড়া দেন। বাকী সবাই প্রচলিত তাক্বলীদী কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পাঠানো এক ব্যাপক প্লাবনের গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল (اَلْمُوصِلُ) নগরীর

যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায়।[৩]

পরবর্তীকালে পিতা ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সকলকেই এই তাক্বলীদী গোঁড়ামীর মুকাবিলা করতে হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কওম স্ব স্ব বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে নবীর আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا، أوَلَوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَـــيْئًا وَّلاَ يَهْتَـــدُوْنَ- 'যখন তাদেরকে বলা হয়েছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলেছে, বরং আমরা বাপ-দাদার আমল থেকে যা পেয়ে আসছি, তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা এসবের কিছুই জ্ঞান রাখত না বা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

তাক্বলীদের সংজ্ঞা (تعريف التقليد) :

তাক্বলীদ 'ক্বালাদাতুন' শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ কণ্ঠহার বা রশি। 'ক্বাল্লাদাল বা'ঈরা' (قَلَّـــدَ الْبَعِيْـــرَ) 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে মুক্বাল্লিদ, যিনি নিজের গলায় কারো আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলা হয়। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, التَّقْلِيْدُ قُبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ فَكَأَنَّهُ لِقُبُوْلِهِ جَعَلَهُ قِلاَدَةً فِى عُنُقِه 'অন্যের কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম 'তাক্বলীদ'। এইভাবে গ্রহণ করার ফলে ঐ ব্যক্তি যেন নিজের গলায় রশি পরিয়ে নিল'।[৪]

---

৩. কুরতুবী, ইবনু কাছীর হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; নবীদের কাহিনী ১/৭০ পৃ.; 'মূছেল' ও 'মাওছেল' (الْمُوصِلُ و الْمَوْصِلُ) দু'টি বানানই এসেছে *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮, ২৩৯৭১)*।

৪. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, হেরাত, আফগানিস্তান (৯৩০-১০১৪ হি./১৫২৪-১৬০৫ খৃ.) প্রণীত শরহ ক্বাছীদাহ আমালী-র বরাতে মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই : মুহাম্মাদ দাঊদ রায (মৃ. ১৯৭১ খৃ.) কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি) ৪৪ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৮।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবা (التقليد والإتباع) :

অনেকেই দু'টি পরিভাষাকে এক করে দেখতে চান। অথচ দু'টির মধ্যে রয়েছে মৌলিক প্রভেদ। 'তাক্বলীদ' হ'ল নবী ব্যতীত অন্য কারো শারঈ বক্তব্যকে বিনা দলীলে কবুল করা। পক্ষান্তরে ছহীহ দলীল অনুযায়ী নবীর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। একটি হ'ল দলীল ছাড়াই অন্যের রায়ের অনুসরণ, অন্যটি হ'ল দলীলের অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ। অন্য কথায় 'তাক্বলীদ' হ'ল রায়ের অনুসরণ, 'ইত্তেবা' হ'ল 'রেওয়ায়াতে'র অনুসরণ। এক্ষণে কারু রায়ের অনুসরণ ও দলীলের অনুসরণের মধ্যে যে অন্ধকার ও আলোর পার্থক্য, তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবার আরবী সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

◈ التَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ قَوْلِ الغَيْرِ (فِى الشَّرْعِ) بِلاَ دَلَيْلٍ وَالْإِتِّبَاعُ هُوَ قُبُوْلُ قَــوْلِ الغَيْرِ (فِى الشَّرْعِ) مَعَ دَلَيْلٍ- ◈ التَّقْلِيْدُ هُوَ قُبُوْلُ الرَّأىِ وَالْإِتِّبَاعُ هُوَ قُبُوْلُ الرِّوَايَةِ، فَالْإِتِّبَاعُ فِى الدَّيْنِ مَسُوْغٌ وَالتَّقْلِيْدُ مَمْنُوْعٌ-

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'তাক্বলীদ হ'ল (শারঈ বিষয়ে) কারু কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা এবং ইত্তেবা হ'ল (শারঈ বিষয়ে) কারু কোন কথা দলীল সহ গ্রহণ করা। তাক্বলীদ হ'ল রায়-এর অনুসরণ এবং 'ইত্তেবা' হ'ল রেওয়ায়াতের অনুসরণ। ইসলামী শরী'আতে 'ইত্তেবা' সিদ্ধ এবং 'তাক্বলীদ' নিষিদ্ধ'।[৫]

একথা পরিষ্কার যে, ইসলাম মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ ও তাঁর নবীর ইত্তেবা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত রায়ের অনুসরণ কখনই করতে বলেনি। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই মানব রচিত কোন মতবাদই, সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হোক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। আর এজন্যেই নবী ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং নবীর ইত্তেবা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

---

৫. মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী (১১৭৩-১২৫৫ হি./১৭৫৯-১৮৩৯ খৃ.) আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০ হি./১৯২১ খৃ.) ১৪ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ....।

মুসলিম সমাজে তাক্বলীদের আবির্ভাব

(حدوث التقليد فى المجتمع الإسلامى)

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের যুগ শেষে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে মুসলিম সমাজে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিভ্রান্তির যুগে তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে।[৬] তবে বিভিন্ন উসতায ও ইমামের তাক্বলীদের ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী দলের উদ্ভব ঘটে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে। যেমন ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ-

‘জেনে রাখ (হে পাঠক!) চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর আগের লোকেরা কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক মাযহাবী তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না’।[৭] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِى الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

‘তাক্বলীদের এই বিদ‘আত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে আবির্ভূত হয়’। অতঃপর তিনি তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল পেশ করেছেন।[৮]

---

৬. হাফেয হাকীম আবু ইয়াহ্ইয়া মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী, ইউ.পি, ভারত (মৃ. ১৩৩৮ হি./১৯২০ খৃ.), আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ (দিল্লী : ১৩১৯ হি.), ৩৮ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৪।
৭. শাহ অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম, দিল্লী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (মিসর : খায়রিয়াহ প্রেস, ১৩২২ হি.) ১/১২২ পৃ.; ঐ, (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১৫২ পৃ.; দু’খণ্ডে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮+২২০=৪১৮।
৮. হাফেয শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ দিমাশক্বী (৬৯১-৭৫১হি./১২৯২-১৩৫০ খৃ.), ই‘লামুল মুওয়াককি‘ঈন (বৈরূত : দারুল জীল ১৯৭৩ খৃ.) ২/২০৮ পৃ.; ঐ, ২/২০৮-২৭৫ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৮।

স্বর্ণযুগে মুসলমানদের অবস্থা ও বর্তমান যুগ

(حكاية حال الناس فى العصر الذهبى وفى العصر الحاضر)

চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন মাযহাবী দলের উদ্ভবের আগে মুসলমানগণ কিভাবে চলতেন? তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কিভাবে সমাধান হ'ত? প্রশ্নটি বর্তমানে মাযহাবী পরিবেশে আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী ও ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের অবস্থা' (بَابُ حِكَايَـــةِ حَالِ النَّاسِ قَبْلَ الْمِائَـــةِ الرَّابِعَـــةِ وَبَعْـــدَهَا) এই শিরোনামে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'তৎকালীন সময়ে কোন মুসলমান কোন তাক্বলীদী মাযহাবের উপরে সংঘবদ্ধ ছিলেন না। তাদের মধ্যে আলেম যেমন ছিলেন, সাধারণ লোকও তেমনি ছিল। সাধারণ লোকেরা তাদের পিতামাতা বা স্থানীয় আলেমগণের নিকট হ'তে ধর্মীয় বিষয়াদি জেনে নিত। যে কোন আলেম হৌক তাঁর কাছ থেকে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করত। এ ব্যাপারে কারও মাযহাব যাচাই করা হ'ত না। আলেমগণের অবস্থা ছিল এই যে, যখন কোন বিষয়ে তাঁরা ছহীহ হাদীছ বা আছারে ছাহাবা পেয়ে যেতেন, শর্তহীনভাবে তার উপরে আমল করতেন। দেখতেন না যে, এই হাদীছটি কোন আলেম বা কতজন আলেম গ্রহণ করেছেন। যখন কোন ব্যাপারে তাদের নিকট দলীল স্পষ্ট হ'ত না, তখন বিগত কোন বিদ্বানের ফৎওয়া তালাশ করতেন। যখন কোন ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি পেয়ে যেতেন, তখন অধিকতর নির্ভরযোগ্য উক্তিটি গ্রহণ করতেন।

কিন্তু এই সুন্দর নিরপেক্ষ যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে লোকেরা ডাইনে বামে চলে গেল। তারা ফিক্বহ সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হ'ল। যার বিবরণ ইমাম গাযালী (রহঃ) দিয়েছেন এভাবে-

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার পরে ইসলামী খেলাফতের শাসনক্ষমতা এমন লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, যারা শরী'আত সংক্রান্ত বিষয়ে ছিলেন অনভিজ্ঞ। ফলে তারা সকল ব্যাপারে আলেমদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখনও আলেমদের মধ্যে এমন কিছু আলেম ছিলেন, যাঁরা স্বর্ণযুগের

বিদ্বানদের ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। তাঁরা বিদ্যা, প্রজ্ঞা ও সরলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। কোন সরকারী পদে তলব করা হ'লে তাঁরা পালিয়ে যেতেন বা প্রত্যাখ্যান করতেন। ফলে সব ধরনের মানুষের শ্রদ্ধা কুড়াতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হ'লেও সত্য যে, সে সময়েও এমন অনেক আলেম ছিলেন, যারা তাদের ইল্মকে দুনিয়াবী ইয্যত ও পদমর্যাদা হাছিলের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। ফলে তারা সমাজের শ্রদ্ধা হারালেন। এভাবে একদিন যারা আহূত হ'তেন, এখন তারা আহ্বানকারী হয়ে গেলেন (فَأَصْبَحَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَ أَنْ كَانُوْا مَطْلُوْبِيْنَ طَالِبِيْنَ)। সরকারী পদ এড়িয়ে চলার ফলে তারা যে মর্যাদা হাছিল করেছিলেন, তা গ্রহণের ফলে তারা ততোধিক মর্যাদাহীন হয়ে পড়লেন।

ইতিপূর্বেই (গ্রীকদের অনুকরণে) মুসলিম পণ্ডিতগণ কালাম শাস্ত্রের কুটতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর এভাবেই আলেমদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে। (এই সুযোগে) খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে শুরু করেন। উভয়পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হ'ল। এ অবস্থা এখনও চলছে। আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতের লিখন কি আছে'।[৯]

অতঃপর শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, আলেমদের এই ফের্কাবন্দীর ফলে সাধারণ মুসলমান যেকোন আলেমের নিকট হ'তে কুরআন ও সুন্নাহ্র ফায়ছালা তলব করার চিরন্তন রীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই নিশ্চিন্ত হ'তে চেষ্টা করে। লোকদের অন্তরে তাক্বলীদ এখন এমনভাবে আসন গেড়েছে, যেমনভাবে পিঁপড়া সবার অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কামড়ে পড়ে থাকে'।[১০]

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) ও ইমাম গাযালী (রহঃ) তাক্বলীদী বিদ'আত প্রচলনের পূর্বে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার যে বাণীচিত্র অংকন করেছেন, তাতে আশা করি যে কোন নিরপেক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য চিন্তার যথেষ্ট খোরাক আছে।

৯. উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী আন-নাইসাপূরী, বাগদাদ (৪৫০-৫০৫ হি./১০৫৮-১১১১ খৃ.)-এর মৃত্যুর দেড় শতাধিক বৎসর পরে ৬৫৬ হিজরীতে এই হানাফী-শাফেঈ ও শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের সুযোগে মোঙ্গল নেতা হালাকু খাঁ (৬১৫-৬৬৪ হি./১২১৮-১২৬৫ খৃ.) কর্তৃক বাগদাদের ইসলামী খেলাফত ধ্বংস হয়।

১০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো : ১৩৫৫হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১৫২-৫৩ পৃ.।

'আমি অজ্ঞ সে কারণে আমাকে যে কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করতেই হবে' একথা বলে তাক্বলীদের পক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে, তার উত্তরও উপরের আলোচনায় এসে গেছে। জেনে রাখা ভাল যে, জানা ও না জানার বিষয়টি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। দু'জন বিজ্ঞ আলেমকেও দেখা যাবে যে, একই সময়ে একটি বিষয় একজনের জানা আছে, অপরজনের জানা নেই। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এরূপ ছিল। এমনকি উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মহামতি চার খলীফা হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান এবং আলী (রাঃ) অনেক হাদীছ না জানার কারণে অন্যান্য ছাহাবীর নিকট থেকে জেনে নিয়ে ফায়ছালা দিতেন। হাদীছের পৃষ্ঠাসমূহে যার ভুরি ভুরি প্রমাণ মওজুদ রয়েছে।[১১] এ যুগেও যদি আমাদের কোন বিষয়ে জানা না থাকে, তাহ'লে আমরাও কোন আলেমের নিকট থেকে জেনে নিব। কেবল একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রশ্নকারী কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই ফায়ছালা চাইবেন, কোন মাযহাবের বা কোন ব্যক্তির নিজস্ব ফৎওয়া নয়। না জানা থাকলে তিনি বলবেন, আমি জানি না। নিজের রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দিলে সেটাও প্রশ্নকারীকে বলে দিবেন। মোটকথা আলেমের কর্তব্য এটাই হবে যে, প্রশ্নকারীকে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে তাকে জান্নাতের পথ বাৎলে দেওয়া। এ ব্যাপারে যদি তাকে জান-মাল, ইযযত ও পদমর্যাদার ঝুঁকি নিতে হয়, তাও নিতে হবে। তথাপি সমাজের ভয়ে বা লৌকিকতার কারণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত সমাজকে জানিয়ে দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে আসা চলবে না। এ ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সর্বদা সামনে রাখতে হবে। যেমন শাহ অলিউল্লাহ স্বীয় 'ইনছাফ' গ্রন্থে বলেন, وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا بَلَغَهُمُ الْحَدِيْثُ يَعْمَلُوْنَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّلاَحِظُوْا شَرْطًا– 'ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকট হাদীছ পৌঁছে গেলে তাঁরা বিনা শর্তে তার উপরে আমল করতেন'।[১২]

---

১১. দ্রষ্টব্য : ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী সূদানী (১১৬৬-১২১৮হি./১৭৫৩-১৮০৪ খৃ.) প্রণীত 'ঈক্বাযু হিমাম' (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) ৬-৯, ৮৭-৮৮ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি্ব'ঈন ২/২৭০-৭২ পৃ.।

১২. শাহ অলিউল্লাহ, আল-ইনছাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখতেলাফ, তা'লীক্ব : আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, সিরিয়া (১৩৩৬-১৪১৭ হি./১৯১৭-১৯৯৬ খৃ.) (বৈরূত: দারুন নাফাইস, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খৃ.) ৭০ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১১।

তাক্বলীদ-এর পরিণাম (نتيجة التقليد)

(১) তাক্বলীদের সর্বাপেক্ষা বড় কুফল হ'ল দলীল বিমুখতা। মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি আলেম হউক বা জাহিল হউক, কুরআন ও হাদীছ হ'তে সরাসরি জ্ঞান আহরণ করার অধিকার তার থাকে না। তাকে স্বীয় ইমাম বা মাযহাবী ফৎওয়া অনুসারে কথা বলতে হয়। এই দলীল বিমুখতার ফলে প্রায় হাযার বছর পূর্বেকার বিভিন্ন ক্বিয়াসী সিদ্ধান্ত, যার কোন কোনটি কুরআন ও হাদীছের সরাসরি বিরোধী, ইসলামের নামে মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যা আজও চলছে।

(২) তাক্বলীদের ফলে অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি যেমন সৃষ্টি হয় অন্ধ ভক্তি, বিরোধী মতের প্রতি সৃষ্টি হয় তেমনি অন্ধ বিদ্বেষ। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয় পারস্পরিক বিভেদ ও দলাদলি। এক ও অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন মাযহাবী দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়ার মূল কারণ হ'ল এই তাক্বলীদ। ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের ইসলামী খেলাফতের নির্মম পরিণতি, ৮০১ হিজরীতে সৃষ্ট কা'বা শরীফে চার মাযহাবের জন্য চার মুছাল্লা কায়েমের বিদ'আত এবং আজও মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে যে পারস্পরিক অনৈক্য বিরাজ করছে, তার অধিকাংশেরই মূল কারণ হ'ল তাক্বলীদী অসহিষ্ণুতা। এক্ষণে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলিম ঐক্য কামনা করি, তাহ'লে প্রত্যেকের সকল যিদ ও অহমিকা ছেড়ে দিয়ে শরী'আতের আওতাধীন জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধকে বিনাশর্তে গ্রহণ করার একটিমাত্র শর্ত যদি আমরা পূরণ করতে পারি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহ পুনরায় একটি অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত হবে। বলা বাহুল্য, যুগে যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সেটাই।

(৩) তাক্বলীদের অনুসারী ব্যক্তি স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তা মানতে পারেন না কেবল এই কারণে যে, হাদীছটি তাঁর মাযহাবের অনুকূলে নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের উপরে বিদ্বানগণের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দানকারী ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত মুমিন হ'তে পারে না *(নিসা ৪/৬৫)*।

(৪) মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি এক ইমামের তাক্বলীদ কতে গিয়ে বাস্তবে অসংখ্য বিদ্বানের মুক্বাল্লিদ হয়ে পড়েন। ফলে বিনা দলীলে ফৎওয়া গ্রহণের সুযোগে ধর্মের নামে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে রকমারি শিরক ও বিদ'আত। অথচ যার নামে মাযহাবী ফৎওয়া প্রদান করা হচ্ছে, গবেষণায় দেখা যাবে যে, তিনি এ সবের নাড়ী-নক্ষত্রও খবর রাখেন না।[১৩]

(৫) তাক্বলীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিণতি হ'ল ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়া। যেমন বাহরুল উলূম আবদুল আলী লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا الْإِجْتِهَادُ الْمُطْلَقُ فَقَالُوْا إِخْتَتَمَ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى أَوْجَبُوْا تَقْلِيْدَ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلاَءِ عَلَى الْأُمَّةِ وَهَذَا كُلُّهُ هَوَسٌ مِّنْ هَوَسَاتِهِمْ لَمْ يَأْتُوْا بِدَلِيْلٍ وَلاَيُعْبأُ بِكَلاَمِهِمْ- 'তারা বলেন, মুৎলাক্ব ইজতিহাদ ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এঁদের যে কোন একজনের তাক্বলীদ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব। অথচ এ সব কথা লোকদের খোশখেয়াল মাত্র। এ সবের কোন দলীল তারা পেশ করেননি এবং তাদের কথার কোন তোয়াক্কা করা যাবে না'।[১৪] অতএব অনাগত ভবিষ্যতের অসংখ্য সমস্যার সমাধান হিসাবে ইসলামকে পেশ করতে হ'লে 'ইজতিহাদ' যে অবশ্যই যরূরী, সে কথা যে কোন নিরপেক্ষ বিদ্বান এক বাক্যে স্বীকার করবেন বলে আশা করি।

---

১৩. যেমন মোল্লা মুহাম্মাদ আল-মুঈন বিন মুহাম্মাদ আল-আমীন সিন্ধী (মৃ. ১১৬১ হি./১৭৪৮ খৃ.) বলেন,
وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ (أى إِلَي الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَةِ) مِنَ الْقِيَاسَات الْبَعِيْدَة الَّتِى تَشَبَهُ التَّشْرِيْعَ الْجَدِيْدَ وَيُنْقَلُ فِى كُتُبِ مَذْهَبِهِمْ فَهُوَ ثَابِتُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ بَلْ أَكْثَرُ ذَالِكَ أَوْ كُلُّهُ مِمَّا ارْتَكَبَهُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّأْىُ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ الخ-
'চার ইমামের দিকে সম্বন্ধ করে মাযহাবী কিতাবসমূহে যে সকল দূরতম ক্বিয়াসী মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা নতুন শরী'আত রচনার শামিল, তা প্রমাণিত নয়। বরং তার অধিকাংশ কিংবা সবটুকুই তাঁদের অনুসারীদের নিজস্ব রায় মাত্র'। -দিরাসাতুল লাবীব (লাহোর : বায়তুস সালত্বানাহ ১২৮৪ হি./১৮৬৮ খৃ. ১৫৬ পৃ. (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬১)। বরং ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃ. ৭০২ হি./১৩০৩ খৃ.) বলেন, نِسْبَةُ هَذِه الْمَسَائِلِ إِلَى الْأَئِمَّة الْمُجْتَهِدِيْنَ حَرَامٌ- 'এই মাসআলাগুলি মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে সম্বন্ধ করা হারাম' (ঈক্বায়ু হিমাম, ৯৯ পৃ.)।

১৪. বাহরুল উলূম আবদুল আলী লাক্ষ্ণৌবী (মৃ. ১২২৫ হি./১৮১০ খৃ.), ফাওয়াতেহুর রাহমূত শরহ মুসাল্লামুছ ছুবূত (লাক্ষ্ণৌ : নওলকিশোর প্রেস ১২৯৫ হি./১৮৭৮ খৃ.) ৬২৪ পৃ.।

তাক্বলীদের বিরোধিতায় চার ইমাম

(الأئمة الأربعة خلاف التقليد)

অনেকের ধারণা প্রসিদ্ধ চার ইমাম প্রচলিত চার মাযহাবের জন্মদাতা এবং তাঁরাই একমত হয়ে চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ উম্মতের জন্য ফরয (?) করে গিয়েছেন। এমনকি ঈমান-একীনের মেহনতের নামে ‘চিল্লাহ’তে গিয়েও তাবলীগী ভাইয়েরা কবিতাকারে তাদের লোকদের ১৩০ ফরযের মধ্যে চার মাযহাবকেও চার ফরয হিসাবে তা‘লীম দিয়ে থাকেন ও মুখস্ত করিয়ে থাকেন।[১৫] নিম্নে প্রদত্ত মাননীয় ইমাম ছাহেবদের জন্ম-মৃত্যু সন ও তাঁদের উক্তিগুলি বিচার করলেই উপরের ধারণাগুলির অসারতা বুঝা যাবে।-

এক নযরে চার ইমাম :

নাম	জন্ম	মৃত্যু	প্রাপ্ত বয়স	জন্মস্থান
আবূ হানীফা নু‘মান বিন ছাবিত (রহঃ)	৮০ হি.	১৫০ হি.	৭০ বছর	ইরাকের কূফা নগরী
মালিক বিন আনাস (রহঃ)	৯৩ হি.	১৭৯ হি.	৮৬ বছর	মদীনা শরীফ
মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ)	১৫০ হি.	২০৪ হি.	৫৪ বছর	সিরিয়ার (বর্তমান ফিলিস্তীন) গাযা এলাকায় জন্ম, বসবাস মক্কায়
আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)	১৬৪ হি.	২৪১ হি.	৭৭ বছর	বাগদাদ নগরী

---

১৫. সংগ্রহকারী : মুহাম্মদ জুলফিকার আহমদ মজুমদার ওরফে এঞ্জিনীয়ার মু.জু.আ. মজুমদার ‘এক মুবাল্লেগের পয়লা নোট বই’ (ঢাকা-৫, পপুলার প্রিন্টিং প্রেস, নিউমার্কেট, অক্টোবর ১৯৭৮) ৪৭ পৃ. পকেট সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭৬।

১. ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلِ فِى دِيْنِ اللهِ تَعَالَى بِالرَّأْىِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ– 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজ নিজ রায় অনুযায়ী কথা বলা হ'তে বিরত থাক, তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হবে।[১৬] তিনি আরও বলেন,

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِىْ أَنْ يُّفْتِىَ بِكَلاَمِىْ– 'আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার গৃহীত দলীল সম্পর্কে অবগত নয়'।[১৭]

এখানে বুযর্গ ইমাম সকলকে তাঁর তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর গৃহীত দলীল যাচাই করে সেই অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কথার নয় বরং দলীলের অনুসরণ করতে বলেছেন। যাকে ইত্তেবায়ে সুন্নাত বলা হয়, তাক্বলীদে ইমাম নয়।

অতঃপর ইমাম আবু হানীফার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শ্রবণ করুন, তিনি বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ– 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১৮] وَكَانَ إِذَا أَفْتَى يَقُوْلُ هَذَا رَأْىُ أَبِى حَنِيْفَةَ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَّرْنَا عَلَيْهِ فَمَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَ مِنْهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ– 'তিনি যখন কোন ফৎওয়া

---

১৬. আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আহমাদ ইবনু আলী আশ-শা'রানী, মিসর (৮৯৮-৯৭৩ হি./১৪৯৩-১৫৬৬ খৃ.) কিতাবুল মীযান (দিল্লী : আকমালুল মাতাবে' ১২৮৬ হি./১৮৭০ খৃ.) ১/৬৩ পৃ. ১৮ লাইন; দু'খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০+২৪৬= ৫০৬।

১৭. কিতাবুল মীযান ১/৬৩ পৃ. ২২ লাইন।

১৮. আমীন ইবনু 'আবেদীন শামী হানাফী (১১৯৮-১২৫২ হি./১৭৮৪-১৮৩৬ খৃ.), রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রে মুখতার (দেউবন্দ : ১২৭২ হি./১৮৫৬ খৃ.) ১/৪৬ পৃ.; ঐ, (বৈরূত: দারুল ফিক্র ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খৃ.) ১/৬৭-৬৮ পৃ.; আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হি./১৮৪৮-১৮৮৬ খৃ.), মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা : মাকতাবা থানবী, তাবি) ১৪ পৃ. ৬ষ্ঠ লাইন।

দিতেন তখন বলতেন, এটি আবু হানীফার রায়। আমাদের সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে বিবেচিত হবে’।[১৯]

২. ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِى رَأْئِى فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوْهُ-

‘আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, সঠিকও বলি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলি গ্রহণ কর, যেগুলি না পাও, সেগুলি পরিত্যাগ কর’।[২০]

তিনি মূলনীতির আকারে বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَمَأْخُوْذٌ مِّنْ كَلاَمِهِ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ إِلاَّ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- ‘দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় এই কবরবাসী ব্যতীত’।[২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত’।[২২]

৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِىْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِى الْحَائِطَ- وَقَالَ يَوْماً لِّلْمُزَنِى يَا إِبْرَاهِيْمُ لاَ تُقَلِّدْنِى فِى كُلِّ مَا أَقُوْلُ وَانْظُرْ فِى ذَالِكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ دِيْنٌ-

---

১৯. কিতাবুল মীযান ১/৬৩ পৃ., ২২ লাইন।

২০. মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ পৃ. ৭৩, গৃহীত : আবুল বারা আল-মিছরী, জালবুল মানফা‘আহ বি তরজমাতিল আইম্মাতিল আরবা‘আহ ৭৪ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৬ (পিডিএফ ১৬৩)।

২১. আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩, ৫২০, ৩৪৩৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২২. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা) ১/১৫০ পৃ.; ঐ, ইক্বদুল জীদ উর্দূ অনুবাদসহ (লাহোর: তাবি) ৯৭ পৃ.।

'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'। তিনি একদা স্বীয় ছাত্র ইব্রাহীম মুযানীকে বলেন, 'হে ইব্রাহীম! তুমি আমার সকল কথার তাক্বলীদ করবে না। বরং নিজে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। কেননা এটা দ্বীনের ব্যাপার'।[২৩]

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন,

لاَ تُقَلِّدْنِى وَلاَ تُقَلِّدَنَّ مَالِكاً وَلاَ الْأَوْزَاعِىَّ وَلاَ النَّخْعِــىَّ وَلاَ غَيْــرَهُمْ وَخُــذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّــنَّةِ-

'তুমি আমার তাক্বলীদ করো না। তাক্বলীদ করো না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখ্ঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ কর কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল উৎস থেকে, যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন'।[২৪]

মহামতি চার ইমামের উপরোক্ত বক্তব্য সমূহের পর আমরা দ্বাদশ হিজরী শতকের ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী-এর একটি আলোচনা উপহার দিয়েই অধ্যায়ের উপসংহার টানব ইনশাআল্লাহ। ইমাম শাওকানী (রহ:) বলেন,

وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ عَالِمٍ أَنَّهُمْ (أى الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ) لَمْ يَكُوْنُوْا مُقَلِّدِيْنَ وَلاَ مُنْتَسِبِيْنَ إِلَى فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْعُلَمَاءِ، بَلْ كَانَ الْجَاهِلُ يَسْئَلُ الْعَــالِمَ عَــنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ الثَّابِتِ فِى كِتَابِ اللهِ أَوْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَيُفْتِيْهِ بِهِ وَيَرْوِيْهِ لَهُ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى، فَيَعْمَلُ بِذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعَمَلِ بِالرِّوَايَــةِ لاَ بِالرَّأْىِ وَهَذَا أَسْهَلُ مِنَ التَّقْلِيْدِ-

'প্রত্যেক বিদ্বান এ কথা জানেন যে, ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন কেউ কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। ছিলেন না কেউ কোন বিদ্বানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত।

২৩. ইক্বদুল জীদ ৯৭ পৃ.; কিতাবুল মীযান ১/৬৬ পৃ. ৬ষ্ঠ লাইন।
২৪. শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৬ পৃ. ৫-৬ লাইন; ইক্বদুল জীদ, ৯৮ পৃ. ৩য় লাইন।

বরং জাহিল ব্যক্তি আলেমের নিকট থেকে কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত শরী'আতের হুকুম জিজ্ঞেস করতেন। আলেমগণ সেই মোতাবেক ফৎওয়া দিতেন। কখনও শব্দে শব্দে বলতেন, কখনও মর্মার্থ বলে দিতেন। সে মতে লোকেরা আমল করত (কুরআন ও হাদীছের) রেওয়ায়াত (বর্ণনা) অনুযায়ী, কোন বিদ্বানের রায় অনুযায়ী নয়। বলা বাহুল্য কারও তাক্বলীদ করার চেয়ে এই তরীকাই সহজতর'।[২৫]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন,

وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا كَلَّفَ أَحَدًا أَن يَّكُوْنَ حَنَفِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا وَحَنْبَلِيًّا بَلْ كَلَّفَهُمْ أَنْ يَّعْمَلُوا السُّنَّةَ-

'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এজন্যে যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হৌক। বরং বাধ্য করেছেন এজন্য যে, তারা সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করুক'।[২৬] বলা বাহুল্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল কথা এটাই।

উপরের আলোচনা সমূহ হ'তে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিগত কোন ইমামই পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কাবন্দীর জন্য দায়ী ছিলেন না, বরং দায়ী আমরাই। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'ইলাহ' বানানোর জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। দায়ী ছিল পরবর্তীকালে তাঁর কিছু সংখ্যক অতিভক্তের দল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাক্বলীদী সংকীর্ণতা হ'তে মুক্তি দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসরণের মাধ্যমে নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কায়েমের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৫. শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০ হি./১৯২১ খৃ.) ১৫ পৃ.।

২৬. সাইয়িদ নযীর হোসায়েন বিহারী দেহলভী (১২২০-১৩২০ হি./১৮০৫-১৯০২ খৃ.) মি'ইয়ারুল হক (সত্যের মানদণ্ড), দিল্লী : মাতবা' রহমানী ১৩৩৭ হি./১৯১৯ খৃ.) ৫৩ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭।

২য় মতবাদ : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

(النظرية الثانية: العلمانية)

Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. 'ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র'।[২৭]

Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কথাটি উপরোক্ত দু'টি বাক্যের মধ্যে নিহিত। দীর্ঘ প্রায় দু'শত বছরের গোলামীর যুগে বৃটিশ বেনিয়া দার্শনিকদের শিখানো 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামক এই মতবাদটি সাফল্যজনকভাবে চালু করার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা সদ্য রাজ্যহারা মুসলিম শক্তিকে নিরুৎসাহিত করতে এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারত উপমহাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে উপমহাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি স্বাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি চালু না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বৃটিশের রেখে যাওয়া উপরোক্ত মতবাদ। ফলে মুসলিম দেশে বাস করেও আমরা অমুসলিম দেশ সমূহের গৃহীত আইন অনুযায়ী শাসিত হচ্ছি। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশ তাদের জনগণের লালিত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মোতাবেক রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলে ও সেই অনুযায়ী দেশ শাসন করে থাকে। কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাদের অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির গৃহীত আইনের লৌহ কঠিন শৃংখলে শাসিত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম দেশগুলির জন্য যে, এই দেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় তাদের নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিফলন নেই। বরং দেশের সংবিধানে অনৈসলামী শাসন দর্শনের গোলামীর চেহারা প্রকটভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাকথিত উদারতাবাদের দোহাই পেড়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামক উক্ত মতবাদটির প্রচলন ঘটানো হয়েছে। যার মূল

---

২৭. অত্র বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বই, ২য় সংস্করণ ২০১৬।

কথাই হ'ল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের কোন বিধান চলবে না। বরং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের গুটিকয়েক গুণী ও নির্গুণ সদস্য কিংবা সামরিক ডিক্টেটর প্রেসিডেন্ট নিজের খেয়াল-খুশীমত যা আইন করে দিবেন, সেটাই দেশের আইন বলে সকলকে মেনে নিতে হবে। পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত অন্য যতগুলি ধর্ম আছে, কারো নিকট আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক দর্শন বা হেদায়াত মওজূদ নেই। তাই একথা নির্বিবাদে বলা যায় যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নামে সৃষ্ট উক্ত মতবাদটি কেবলমাত্র ইসলামকেই মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে বের করে দেবার জন্য ইহূদী-নাছারা বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতকে আবিস্কৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই আধুনিক মতবাদটি অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও বিশ্ব ইতিহাসের অতুলনীয় রাজনৈতিক দলীল 'মদীনার সনদ'-এর রচয়িতা ও ঐতিহাসিক 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'তে স্বাক্ষরদানকারী কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিশারদ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (*ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর প্রচারিত ও আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ শরী'আত ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে ইসলামী শরী'আতে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় জীবনের জন্য চিরন্তন হেদায়াত সমূহ মওজূদ রয়েছে। যা যথাযথভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল

(سوء عاقبة العلمانية)

১. 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর প্রধান লক্ষ্য হ'ল ইসলামকে মানুষের বৈষয়িক জীবন থেকে বিতাড়িত করে আধ্যাত্মিক জীবনে বন্দী করে ফেলা। অতঃপর সেখান থেকেও ক্রমে ক্রমে বিদায় করে দিয়ে মানুষকে পুরা নাস্তিক ও বস্তুবাদী করে তোলা। এই লক্ষ্যের প্রথম স্তরে তারা অত্যন্ত দ্রুত সফলতা লাভ করেছে এবং মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বর্তমানে এই দর্শন নামে-বেনামে রাষ্ট্রীয়ভাবেই চালু হয়ে গেছে। চূড়ান্ত স্তরের মহড়াও প্রায় সব দেশেই কিছু কিছু চলছে সে সব দেশের কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী দলগুলির মাধ্যমে ও

তাদের প্রচারিত সাহিত্য-সাময়িকী, বই ও পত্র-পত্রিকা তথা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহের মাধ্যমে।

২. এই দর্শনের ফলে মুসলমানরা ইসলামকে অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ ভাবতে শুরু করেছে। ফলে চৌদ্দশ' বছরের পুরনো ইসলাম এ যুগে অচল বলতেও মুসলিম শিক্ষিত সন্তানের জিহ্বা আড়ষ্ট হয় না। বরং উল্টা অপবাদ ছড়ানো হয় যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থায় অমুসলিমদের জন্য কোন বিধান নেই।

৩. এই দর্শনের মারাত্মক কুফল হিসাবে মুসলমান তার আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ্র আইন ও বৈষয়িক জীবনে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ-এর আসনে বসিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً-

'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(৪৩)*। 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*।

৪. এই দর্শনের বাস্তব ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের নেতারা রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সোচ্চার গলায় শিরকী কালাম উচ্চারণ করে বলেন, 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। একই কারণে সূদভিত্তিক হারামী অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করতে এবং দেশবাসীকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় 'হারামখোর' বানাতেও আমাদের মুসলিম নেতাদের অন্তর আল্লাহ্র গযবের ভয়ে প্রকম্পিত হয় না। স্বীয় পদমর্যাদার অপব্যবহার করে লাখ লাখ ঘুষের টাকা পকেটে ভরতেও এদের হাত কাঁপে না। ডাক্তারের চেয়ারে বসে অসহায় রোগীর পকেট ডাকাতি করতেও এদের বিবেকে বাধে না। মাল মওজূদ করে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টি করতেও এরা জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয় না। জুয়া-লটারী আর স্মাগলিংয়ের হারামী পয়সায় খাবার কিনে নিষ্পাপ কচি মা'ছূম বাচ্চার মুখে তুলে দিতেও এদের পাষাণ পিতৃহৃদয় ভয়ে আঁৎকে

Contents

ওঠে না। কারণ তার বিশ্বাস অনুযায়ী এ সবই হ'ল বৈষয়িক ব্যাপার। এখানে আবার জান্নাত-জাহান্নাম কি? তাই একজন লোক মসজিদে পাক্কা মুছল্লী এবং 'আলহাজ্জ' লকব নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেও বৈষয়িক ব্যাপারে তার কোনই প্রভাব পড়বে না, যদি নাকি ঐ ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হয়। তার দ্বীন তার দুনিয়ার উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। বরং দুনিয়াবী লাভ-লোকসানই হবে তার সকল কাজের নৈতিক মানদণ্ড। যাঁরা দেশের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না বরং আলীশান খানক্বাহে বসে মা'রেফাতের সবক দেন কিংবা বার্ষিক ওরস ও ঈছালে ছওয়াব এবং প্রাত্যহিক নযর-নেয়াযের দৈনিক ব্যালান্স হিসাব করায় সদা ব্যস্ত থাকেন, তারাই এদেশে 'দ্বীনদার' বলে খ্যাত। জানি না ইসলামের মহান নবী (ছাঃ) ও তাঁর খলীফাগণকে এরা দ্বীনদার বলবেন, না 'দুনিয়াদার' বিশেষণে বিশেষিত করবেন।

আমরা যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজ গঠনের শপথ নিয়েছি, নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনা হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে উপরোক্ত জাহেলী মতবাদটি সম্পর্কে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে এবং নিজেকে ও নিজের পরিবার ও সমাজকে এই ইসলাম ধ্বংসকারী খৃষ্টানী মতবাদ হ'তে এবং এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।[২৮]

২৮. আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.) বলেন, جب جدا ہو دین سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی 'যখন রাজনীতি হ'তে দ্বীন পৃথক হয়ে যায়, তখন সেখানে কেবল চেংগীযী বর্বরতাই অবশিষ্ট থাকে' এ কথার বাস্তবতা আজ পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই দেখা যাচ্ছে।

৩য় মতবাদ : ধর্মই রাজনীতি

(النظرية الثالثة : الدين هو السياسة)

'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা বস্তু' এই মর্মের চরমপন্থী মতবাদ তথা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে আবিষ্কার হওয়ার কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে 'রাজনীতিই ধর্ম' এই মর্মের ঠিক উল্টা আর এক চরমপন্থী মতবাদের উদ্ভব ঘটে ভারতে ইসলামের নামে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এই মতবাদটি পুরা ইসলামকেই রাজনীতি গণ্য করেছে এবং রাজনীতির আলোকে ইসলামের সকল অনুষ্ঠানকে বিচার করেছে। যেমন বলা হয়েছে,

دین دراصل حکومت کا نام ہے- شریعت اس حکومت کا قانون ہے- اور عبادت اس قانون وضابطہ کی پابندی ہے- 'দ্বীন আসলে হুকুমতের নাম। শরী'আত হ'ল ঐ হুকূমতের কানূন। আর ইবাদত হ'ল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'।[২৯] অতঃপর ইবাদতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে-

اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز روزہ اور تسبیح وتہلیل کا نام ہے اور دنیا کے معاملات سے اس کو کچھ سروکار نہیں، حالانکہ دراصل صوم وصلوۃ اور حج وزکوۃ اور ذکر, تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لئے مستعد کرنیوالی تمرینات (Training courses) ہیں-

'ঐ ইবাদত যে সম্পর্কে লোকেরা বুঝে রেখেছে যে, তা কেবল ছালাত-ছিয়াম ও তাসবীহ-তাহলীলের নাম, দুনিয়াবী বিষয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ আসল কথা হ'ল ছওম ও ছালাত, হজ্জ ও যাকাত, যিক্র ও তাসবীহ মানুষকে উক্ত বড় ইবাদতের (তথা হুকূমত ও অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়ের) জন্য প্রস্তুতকারী অনুশীলন বা ট্রেনিং কোর্স মাত্র'।[৩০]

---

২৯. খুত্বাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭) ৩২০ পৃ.।
৩০. তাফহীমাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৭৯), ১/৬৯ পৃ.।

পর্যালোচনা (مراجعة النظرية الثالثة التطرفية)

১. বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত উক্ত চরমপন্থী দর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজের একটি অংশ যেনতেন প্রকারেণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনকেই 'মূল ইবাদত' ভাবতে শুরু করেছে এবং ইসলামের ফারায়েয-ওয়াজিবাত প্রভৃতিকে 'ছোট-খাট বিষয়' বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২. এই দর্শন দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম রূপে গণ্য করেছে। অথচ ইসলামের যাবতীয় ইবাদতের মূল লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, কোনমতেই দুনিয়া অর্জন নয়। আল্লাহ বলেন, فَأَعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الـــدِّيْنَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেছ আনুগত্য সহকারে' *(যুমার ৩৯/২)*।

৩. এই দর্শন স্বীয় লক্ষ্য হাছিলের জন্য পবিত্র কুরআনের কয়েকটি শব্দের অপব্যাখ্যা করেছে। যেমন 'দ্বীন' অর্থ হুকূমত। 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ ইক্বামতে হুকূমত। 'ইবাদত' অর্থ আনুগত্য। এখানে আল্লাহ্র উপাসনা ও সরকারের আনুগত্যকে এক করে দেখানো হয়েছে।[৩১] যার বাস্তব ফলশ্রুতিতে মানুষের নিজের নফস বা দেশের সরকার সবই মা'বূদ-এর আসন দখল করে নিয়েছে। অথচ এই আক্বীদা পোষণ করলে অনৈসলামী সরকারের আনুগত্যকারী কিংবা নফসের পূজারী প্রত্যেক মুসলিমকে মুশরিক ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলতে হয়, যা কুরআন ও হাদীছের সম্পূর্ণ বরখেলাফ মু'তাযিলী ও খারেজী আক্বীদার সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি তওবা না করে মারা গেলে সে কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।[৩২] মু'তাযিলীদের মতে সে মুমিন নয়, কাফিরও নয়। তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

---

৩১. তাফহীমাত ১/৪৯-৬৩ পৃ.।

৩২. উক্ত চরমপন্থী আক্বীদার কারণেই ইসলামের প্রথম যুগে খারেজীরা খলীফা আলী, মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর রক্তকে হালাল গণ্য করেছিল এবং হযরত আলীকে হত্যা করেছিল।

৪. ‘দ্বীন আসলে হুকূমত’ এই দর্শনটি আরেকটি দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটি হ’ল দ্বীনের জন্য দুনিয়া, না দুনিয়ার জন্য দ্বীন? আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায় ‘ধর্মের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ধর্ম’? ইসলামের মতে দ্বীনের জন্য যিনি জীবন দেন, তিনি হন ‘শহীদ’। নাস্তিক পণ্ডিতগণের মতে ধর্মের জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষ নিজেই ধর্মকে বা আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। যার অর্থ দাঁড়ায় দ্বীনের জন্য দুনিয়া নয়, বরং দুনিয়ার জন্য দ্বীন।

এক্ষণে যদি দ্বীন আসলে হুকূমত হয় এবং ইসলামের বুনিয়াদী ফরয সমূহ তথা ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ প্রভৃতি উক্ত হুকূমত বা রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের অনুশীলন বা ট্রেনিং কোর্স হয়, তাহ’লে এই দর্শনটি উপরোক্ত বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হুকূমত বা রাষ্ট্র ক্ষমতা হাছিলের পরে ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদির ট্রেনিং কোর্স অব্যাহত থাকবে কি? এ বিষয়ে উক্ত দর্শনের মূল হোতা ইসমাঈলী শী‘আ ও গ্রীক দর্শনের উচ্ছিষ্ট ভোজী তথাকথিত ছূফীবাদের অনুসারীদের মধ্যে দু’ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। এক দলের মতে সাধনার উচ্চমার্গে পৌঁছনোর পরে কিংবা আমল ও আচরণ ভাল হওয়ার পর, তার জন্য ইসলামের অবশ্য পালনীয় ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি পালনের কোন প্রয়োজন নেই। আর একদল সর্বাবস্থায় এগুলি যরূরী মনে করেন।[৩৩]

৫. এই দর্শনের অনুসারীগণ মনে করেন যে, দুনিয়ায় নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ‘হুকূমতে ইলাহিয়াহ’ বা আল্লাহ্র হুকূমত কায়েম করা। অতঃপর কুরআনের সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতাংশ ‘আক্বীমুদ্দীন’-এর অনুকরণে তারা ‘হুকূমতে ইলাহিয়ার’ বদলে ‘ইক্বামতে দ্বীন’ পরিভাষাটি চালু করেছেন। অথচ পবিত্র কুরআনে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন দুনিয়াতে আত্মভোলা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে ও জাহান্নামের ভয়

---

৩৩. বিস্তারিত দেখুন : ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), আর-রাদ্দু ‘আলাল মানতেক্বিইঈন ১৪৫ পৃ.; ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ১/৯৬ পৃ.।

দেখাতে। তাদের সামনে আল্লাহ প্রেরিত আয়াত সমূহ শুনাতে, তাদেরকে পবিত্র করতে এবং কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতে *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬; জুম‘আ ৬২/২)*।

হুকূমত কায়েম করাই যদি নবী আগমনের উদ্দেশ্য হ’ত তাহ’লে তো বলতেই হয় যে, লক্ষাধিক নবী-রাসূলের মধ্যে কেবলমাত্র হযরত দাঊদ, সুলায়মান ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত আর সকলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যে ইব্রাহীম (আঃ) আগুনে পুড়লেন না, তিনি কেন স্বীয় নবুঅতী শক্তি বলে নমরূদকে হটিয়ে সিংহাসনে না বসে বরং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াকেই উত্তম মনে করলেন? প্রথমেই সম্রাট বিরোধী শ্লোগান না দিয়ে তিনি কেন নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গতে গেলেন? অত্যাচারী ফেরাঊন সদলবলে নদীতে ডুবে মরার পরে কেন মূসা (আঃ) তার শূন্য সিংহাসন দখল করে বীরদর্পে ‘হুকূমতে ইলাহিয়াহ’ কায়েমের সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া করলেন? মোর্দাকে যিন্দা করার অলৌকিক ক্ষমতা দান করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক কেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে তৎকালীন সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ না দিয়ে তাকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন? আমাদের নবীকেই বা কেন মক্কার গুটিকয়েক কাফের নেতার মোকাবিলায় আল্লাহ পাক রাতের অন্ধকারে সুদূর মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন?

বুঝা গেল যে, আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনই ছিল নবীদের সমস্ত দাওয়াত ও তাবলীগের মূল লক্ষ্য। আর এটা অত্যন্ত সহজ কথা যে, সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ’ল ব্যক্তির আক্বীদায় বিপ্লব আনা। আক্বীদায় পরিবর্তন এলে তার রাজনীতি-অর্থনীতি তথা কর্মজীবনের বিস্তীর্ণ পরিসরে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। নবীগণ এই মৌলিক কাজটিই করে গিয়েছেন।

৬. এই দর্শনের অনুসারীরা তাঁদের মতের পক্ষে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি সুপরিচিত আয়াতকে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন- إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ‘নেই কারো হুকুম আল্লাহ ব্যতীত’ (ইঊসুফ ১২/৪০)। وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ...هُمُ الظَّالِمُوْنَ...هُمُ الْفَاسِقُوْنَ– ‘যারা আল্লাহ্র

নাযিলকৃত হুকুম অনুযায়ী ফায়ছালা করেনা, তারা কাফের... যালেম...ফাসেক' *(মায়েদাহ ৫/৪৪, ৪৫, ৪৭)*।

প্রথম আয়াতটি হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর জেলখানার কয়েদী বন্ধুদের যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা। তিনি পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তৎকালীন মিসরের কুফরী হুকূমতের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা 'আযীযে মিছরে'র অধীনে খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন (যারা অনৈসলামী সরকারের অধীনে চাকুরী করা নাজায়েয বলতে চান, তারা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন)। অতঃপর সূরা মায়েদাহ্র আয়াতগুলি আহলে কিতাবগণকে তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করার জন্য বলা হয়েছে।

এক্ষণে আয়াতগুলি যদি সাধারণ অর্থে নেওয়া হয়, তাহ'লে ইউসুফ ৪০ আয়াতটি 'হুকমে তাকভীনী' বা প্রাকৃতিক বিধান অর্থে নিতে হবে। যার অর্থ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্র হাতে। এর অর্থ কখনোই রাষ্ট্রীয় বিধান নয়, যা পরিষ্কারভাবে 'হুকমে আক্বলীর' অন্তর্ভুক্ত। এটির অর্থ 'হুকমে শারঈ'ও নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজে নবী হয়ে এবং নিজে এই আয়াতের প্রবক্তা হয়ে তার বিরোধিতা করে কুফরী হুকূমতের অধীনে কোন দায়িত্ব পালন করতেন না। বরং হুকূমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতেন।

অতঃপর সূরা মায়েদাহ্র ৩টি আয়াত ইসলামী রাষ্ট্রের ও আদালতের বিধান হিসাবে গণ্য হবে। যেন শাসক ও বিচারকগণ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচার-ফায়ছালা করেন। অবশ্য যদি কোন বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট দলীল না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে শাসক ও বিচারকগণ ইজতেহাদের ভিত্তিতে রায় দিতে পারবেন।[৩৪]

---

৩৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াতের فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِيْ يَــذْهَبُوْنَ إِلَيْــهِ 'এর অর্থ কুফরী নয়, যেদিকে লোকেরা গিয়েছে' *(হাকেম ২/৩১৩ পৃ. হাদীছ ছহীহ)*। ত্বাঊস বলেন, لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ 'এর অর্থ ঐ কুফরী নয় যা তাকে ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়'। আত্বা বলেন, এটি কুফরীর পরে সবচেয়ে বড় পাপ' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। এক্ষণে আয়াতগুলির মর্ম হ'ল এই যে, যদি কোন মুসলিম শাসক ও বিচারক আল্লাহকৃত কোন হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বাস্তবে উক্ত হারাম কাজ সম্পাদন করেন, তাহ'লে তিনি ফাসেক ও পাপাচারী মুসলিম হিসাবে

৭. অনৈসলামী হুকূমতের কোন আইন মানা চলবে না। এই ভুল চিন্তা-ধারার প্রসার ঘটার ফলে এদেশের তরুণ সমাজ যেমন সরকার বিরোধিতাকেই বড় জিহাদ ভাবতে শুরু করেছে, ভারতীয় মুসলিমদের একাংশ তেমনি সে দেশের বিভিন্ন সরকারী পদ ও দায়িত্ব ছেড়ে আসার ফলে সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হ'তে চলেছে।[৩৫]

৮. আল্লাহ্র হুকুম ও সরকারের হুকুমকে এক করে দেখার এই দর্শনটি কোন নতুন দর্শন নয়। ইসলামের প্রথম যুগে চতুর্থ খলীফার আমলে সৃষ্ট খারেজী ফিতনার মূল শ্লোগান ছিল এটা। ঐতিহাসিক ছিফ্ফীন যুদ্ধের শেষে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার শালিশী বৈঠকের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও হযরত আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া আট হাযার সৈন্য যারা ইতিহাসে 'খারেজী' বা দলত্যাগী নামে খ্যাত, তারাও হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে لاَ حُكْــمَ إِلاَّ لِلّٰهِ 'নেই কারও শাসন আল্লাহ ব্যতীত' এই শ্লোগান তুলেছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাদের জওয়াবে বলেছিলেন, كَلِمَــةٌ عَادِلَةٌ يُرَادُ بِهَا جَوْرٌ، إِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ أَلاَّ إِمَارَةَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ إِمَارَةٍ بَرَّةً أَوْ فَاجِرَةً– 'কথা ঠিক কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে। এরা বলতে চায় যে, (আল্লাহ ছাড়া কারও) শাসন নেই। অথচ অবশ্যই শাসন ক্ষমতায় ভাল ও মন্দ সব ধরনের লোকই আসতে পারে'।[৩৬]

হযরত আলী (রাঃ), হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও দু'পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ও হযরত আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)

গণ্য হবেন। তওবা না করলে বিষয়টি আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে। চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন। কেননা কবীরা গুনাহগার মুসলিম 'কাফের' হয়না। কিন্তু খারেজীদের মতে ঐ ব্যক্তি কাফের হবে *(কুরতুবী)*। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তার রক্ত হালাল।

আলোচ্য তৃতীয় মতবাদটির অনুসারীগণ সূরা মায়েদাহ্র অত্র আয়াত তিনটিকে তাদের চরমপন্থী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেটা স্রেফ অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। তারা দেশে ও বিদেশে মুসলিম উম্মাহকে চরম পরীক্ষায় নিপতিত করেছে।

৩৫. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, আল-হারাকাতুস্ সালাফিইয়াহ বে-কেরেলা, সেক্রেটারী নদওয়াতুল মুজাহেদীন (তিরূর, কেরালা, ভারত ১৯৮২) ১৫-১৮ পৃ.।

৩৬. ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি./৮২৮-৮৮৯ খৃ.), আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাহ ১/১৫৬ পৃ.।

প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছাহাবী। তাঁরা অবশ্যই সূরা ইউসুফের ৪০ আয়াতের মর্ম বুঝতেন। তাঁরা হুকূমত পরিচালনাকে হুকমে শারঈ বা ইবাদতের পর্যায়ে ফেলেননি। বরং এটাকে হুকমে আক্বলী বা বৈষয়িক ব্যাপার বলে গণ্য করেছিলেন। যতক্ষণ না সেটা শরী'আতের কোন হুকুমকে অর্থাৎ হুকমে শারঈকে লংঘন করে। এই পার্থক্য না বুঝার ফলে কলেজ-মাদ্রাসার বাচ্চা ছেলেরাও যখন এই সব মহান ব্যক্তিদের সমালোচনা করে, তখন সত্যিই দুঃখ হয়। এ বিষয়ের আলোচনা 'মধ্যপন্থা' অধ্যায়ে দেখুন।

এখানে একটি সর্বসম্মত মূলনীতি মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। পরবর্তীকালে দেওয়া কারু কোন কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা যদি ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যার প্রতিকূলে হয়, তবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

৯. এই দর্শন ইসলামকে 'কুল দ্বীন' (جامعیۃ الدین) বা সর্বব্যাপী জীবন বিধান হিসাবে পেশ করেছে। বলা হয়েছে,

یہ کوئی بنئے کی دکان کا سودا نہیں ہے کہ جو سودا چاہا اور جتنا چاہا لے لیا اور جو چاہا چھوڑ دیا- ایسا کرنا دین کے بعض حصہ پر ایمان لانا اور بعض کا کفر کرنا ہے- یا تو پورے کا پورا سودا لینا ہو یا سب کا سب چھوڑنا پڑیگا-

'এটি কোন বণিকের দোকান নয় যে, ইচ্ছামত দোকানের কোন মাল কিনবে ও কোন মাল ছাড়বে। এরূপ করা দ্বীনের কোন অংশের উপর ঈমান আনা ও কোন অংশের সঙ্গে কুফরী করার শামিল। হয় (ইসলাম রূপী দোকানের) সবকিছু খরীদ করতে হবে, নয় সবটুকুই ছাড়তে হবে।'[৩৭]

কথাগুলি আপাত মধুর হ'লেও এর মধ্যে রয়েছে বিরাট শুভংকরের ফাঁকি। ভ্যারাইটি স্টোরে রকমারি জিনিষের বিরাট স্টক থাকতে পারে, তাই বলে

৩৭. হাকীম ওবায়দুল্লাহ খান, ইসলামী সিয়াসাত ইয়া সিয়াসী ইসলাম (শ্রীনগর, কাশ্মীর ১৯৭৮ খৃ.) ২৩ পৃ.।

একজন খরিদ্দারকে সবকিছুই একত্রে কিনতে হবে, এটা কেমন দাবী? ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। একথা শতকরা একশত ভাগ সত্য। কিন্তু তাই বলে ইসলাম গ্রহণকারী একজন মুসলিমকে একই সাথে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিচরণ করতে হবে এবং সবকিছুতেই সমান পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে এটা কেমন কথা? ইসলাম তো এ দাবী কোন মুসলমানের নিকট করেনি যে তাকে একই সঙ্গে ভাল আলেম, ভাল চাষী, ভাল শিল্পী, ভাল ব্যবসায়ী, ভাল ডাক্তার, ভাল রাজনীতিক, ভাল সমাজনেতা সবকিছুই হ'তে হবে। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, একজন মানুষ কখনোই সকল কাজে পারদর্শী হ'তে পারে না। এমনকি একজন ভাল মুসলমান শত চেষ্টায় হয়তবা জীবনে যাকাত বা ওশর আদায়ের কিংবা হজ্জ করার মত বুনিয়াদী ফরয আদায়ের যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেন না।

এক্ষণে একজন লোক স্বীয় অযোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে রাজনীতি করেন না। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি পূর্ণভাবে ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। ইনি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হবেন কি? আধুনিক এই দর্শনের মতে ঐ ব্যক্তি আর যাই হোক পূর্ণাঙ্গ মুসলিম নন। কারণ ইসলামের মূল ইবাদতটিই তার জীবন থেকে বাদ পড়ে গেছে। তবে হ্যাঁ ঐ ব্যক্তি আর কোন দিক দিয়ে তেমন যোগ্য না হ'লেও যদি রাজনীতিতে পারঙ্গম হন, তাহ'লে বোধ হয় এই দর্শনের অনুসারীদের মতে তিনি পূর্ণাঙ্গ মুমিন (?) হ'তে পারেন। কারণ রাজনীতির আলোকেই তাঁরা মুসলমানকে বিচার করেন। বিচার বুদ্ধির এই মাপকাঠির কারণেই বিগত যুগের বড় বড় মুজাদ্দিদগণ কেউই এঁদের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ মুজাদ্দিদ হ'তে পারেননি। কেননা তাঁরা নিজ নিজ সময়ের সরকারের বিরুদ্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি কিংবা স্বাধীনভাবে কোন ইসলামী হুকূমত কায়েম করেননি।

কুল দ্বীন ও ইক্বামতে দ্বীন-এর ব্যাখ্যা :

'কুল দ্বীন' অর্থ সামগ্রিক দ্বীন ও 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ, যার সঠিক ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে, যিনি জীবনের যে শাখায় কাজ করবেন, তিনি সেই শাখায় দ্বীনের সামগ্রিক হেদায়াত মেনে চলবেন। যিনি ব্যবসায়ী

Contents

হবেন তিনি স্বীয় ব্যবসা ক্ষেত্রে 'ইক্বামতে দ্বীন' করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে থেকে তিনি ব্যবসা করবেন। যিনি রাজনীতিক হবেন তিনি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে রাজনীতি করবেন এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শরী'আতের বিধান সমূহ প্রবর্তন ও বলবৎ করার চেষ্টা করবেন। যিনি চাকুরী করবেন তিনিও সেখানে দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলবেন। যিনি বিদ্বান হবেন, তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিকে অন্যান্য মতাদর্শের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার পিছনে ব্যয় করবেন। মোটকথা আল্লাহ পাক দুনিয়ার এ সংসার আবাদ করার জন্য যাকে যে কাজের যোগ্য করে পাঠিয়েছেন, তিনি সে কাজে অবশ্যই সাধ্যপক্ষে আল্লাহ্র আইন মেনে চলবেন। একেই বলে 'ইক্বামতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা। আর এভাবেই অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয়ী হ'তে পারে। অতঃপর মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হেদায়াত মওজূদ থাকার কারণে ইসলাম অবশ্যই একটি 'কুল দ্বীন' বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ব্যতীত প্রচলিত কোন ধর্মই আল্লাহ প্রেরিত নয় এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নয়।

১০. হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদ (التشكيك في الحديث النبوى صــ) :

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত অতি যুক্তিবাদী এই দর্শনটি ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে সন্দেহবাদ আরোপ করেছে। আর পরবর্তীকালে ভ্রষ্টতার যুগে রচিত ভুল-শুদ্ধ পারস্পরিক ইখতেলাফে ভরা ফিক্বহ শাস্ত্রকে রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর হাদীছের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চেষ্টা করেছে। এমনকি আল্লাহ্র কিতাবের পরে বিশুদ্ধতম হাদীছ গ্রন্থ ছহীহ বুখারী সম্পর্কে কথা বলতেও এই আধুনিক দর্শন মোটেই পিছপা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে,

کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہونچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے- مثلاً بخاری، جسکے بارے میں أصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنیوالا بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ اس میں جو چھ سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے-

'কোন শরীফ লোক এ কথা বলতে পারে না যে, হাদীছের যে সমষ্টি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার সবটা অকাট্যভাবেই ছহীহ। উদাহরণ স্বরূপ বুখারী, যাকে আল্লাহ্র কেতাবের পরে বিশুদ্ধতম কেতাব বলা হয়, হাদীছের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অতিরঞ্জনকারীও এ কথা বলতে পারে না যে, এর মধ্যে যে ছয়-সাত হাযার হাদীছ সংকলিত আছে, তার সবটাই ছহীহ'।[৩৮] (নাঊযুবিল্লাহ)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেবল ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উপহার দিয়েই প্রসংগের ইতি টানতে চাই। তিনি বলেন,

أَمَّا الصَّحِيْحَانِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْهَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوْعِ صَحِيْحٌ بِالْقَطْعِ وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفَيْهِمَا وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يُّهَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُّتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'ছহীহায়েন অর্থাৎ ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম সম্পর্কে হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, এ দু'য়ের মধ্যে মুত্তাছিল মরফূ' যত হাদীছ রয়েছে, সবই অকাট্যভাবে ছহীহ। যে ব্যক্তি ঐ দুই গ্রন্থ সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করবে সে বিদ'আতী এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধী তরীকার অনুসারী'।[৩৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৩৫৬ হিজরীর ছফর মোতাবেক ১৯৩৭ সালের মে সংখ্যা 'তারজুমানুল কুরআনে' 'মাসলাকে ই'তিদাল' নামে প্রকাশিত ও ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীতে 'তাফহীমাত' ১ম খণ্ডে সংকলিত ৩৫০ হ'তে ৩৬৪ পর্যন্ত ১৫ পৃষ্ঠার বিরাট প্রবন্ধটি হাদীছ অস্বীকারকারীদের জন্য একটি বড় সান্ত্বনা বৈ-কি। প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ 'সুষম মতবাদ' নামে ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে বের হয়েছে।

---

৩৮. লাহোরের বরকত আলী হলের বক্তৃতা। লাহোর হ'তে প্রকাশিত উর্দূ সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম ২৭শে মে ও ৩রা জুন সংখ্যা ১৯৫৫ সাল।

৩৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, (মিসর: খায়রিয়া প্রেস ১৩২৩ হি./১৯০৫ খৃ.) ১/১০৬ পৃ.; ঐ (কায়রো : দারুত তুরাছ ১৩৫৫হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১৩৪ পৃ.।

হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহবাদ সৃষ্টি করলেও ফিক্বহ সম্পর্কে এই দর্শন তার অগাধ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে। যেমন বলা হয়েছে,

امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ بکثرت ایسے مسائل دیکھتے ہیں جو مرسل اور معضل اور منقطع احادیث پر مبنی ہیں، یا جن میں ایک قوی الاسناد حدیث کو چھوڑ کر ایک ضعیف الاسناد حدیث کو قبول کیا گیا ہے، یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہیں اور امام ابو حنیفہ اور انکے اصحاب کچھ کہتے ہیں- یہی حال امام مالک کا ہے- باوجودیکہ اخباری نقطۂ نظر ان پر زیادہ غالب ہے مگر پھر بھی انکے تفقہ نے بہت سے مسائل میں انکو ایسی احادیث کے خلاف فتوی دینے پر مجبور کر دیا جنہیں محدثین صحیح قرار دیتے ہیں- چنانچہ لیث بن سعد نے انکی فقہ سے تقریباً ستر مسئلے اس نوعیت کے نکالے ہیں- امام شافعی کا حال بھی اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں-

‘ইমাম আবু হানীফার ফিক্বহের মধ্যে আপনারা এমন বহু মাসআলা দেখেন যা মুরসাল, মু‘যাল ও মুনক্বাতে‘ হাদীছ সমূহের উপর ভিত্তিশীল।[৪০] অথবা এসবের মধ্যে অনেক শক্তিশালী সনদের হাদীছ বাদ দিয়ে যঈফ সনদের হাদীছ গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কোন মাসআলায় দেখা যাবে যে, হাদীছ সমূহ একরূপ বলছে এবং ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী অন্যরূপ বলছেন। একই অবস্থা ইমাম মালিক-এর। তথ্য নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে জোরালো থাকা সত্ত্বেও ফিক্বহের বুঝ তাঁকে এমনামন হাদীছ সমূহের

৪০. ‘মুরসাল’ যার শেষ সনদে তাবেঈর উস্তাদের নাম বিচ্ছিন্ন। ‘মু‘যাল’ যার মধ্য সনদে পর পর দুই বা ততোধিক রাবীর নাম বিচ্ছিন্ন। ‘মুনক্বাতে‘ যার মধ্য সনদে এক বা একাধিক রাবীর নাম অসংলগ্নভাবে বিচ্ছিন্ন’। সকল হাদীছের হুকুম অগ্রাহ্য’। =সায়ফুর রহমান আহমাদ (মৃ. ১৪৩১ হি./২০১০ খৃ.), আস্-সাহ্লুল মুসাহ্হাল ফী মুছত্বালাহিল হাদীছ ‘আলাল বায়কূনিইয়াহ (দারুল হাদীছ, মদীনা মুনাউওয়ারাহ) প্রকাশক : ইদারা এহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ, সারগোধা, পাকিস্তান, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খৃ., ১৮-১৯ পৃ.; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯।

খেলাফ ফৎওয়া দিতে বাধ্য করেছে, যেগুলি মুহাদ্দিছগণ ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। লাইছ বিন সা'দ নিজের ফিক্বহী বুঝ অনুযায়ী এই ধরনের প্রায় ৭০টি ফৎওয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈর অবস্থাও এ থেকে তেমন বেশী কিছু ভিন্ন নয়'।[৪১]

উপরোক্ত আলোচনার আগেই মাননীয় লেখক নিজের মন্তব্য পেশ করে বলেন,

جسطرح حدیث کو بالکلیہ رد کر دینیوالے غلطی پر ہیں اسی طرح وہ لوگ بہی غلطی سے محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے حدیث سے استفادہ کرنے میں صرف روایات ہی پر اعتماد کر لیاہے- مسلک حق ان دونوں کے درمیان ہے- اور یہ وہی مسلک ہے جو ائمۂ مجتہدین نے اختیار کیاہے- 'যেভাবে হাদীছকে একেবারে অস্বীকারকারীরা ভুলের উপর আছেন, অমনিভাবে ঐসব লোকেরাও ভুল থেকে নিরাপদ নন, যারা হাদীছ থেকে ফায়েদা নেবার সময় কেবল হাদীছের রেওয়ায়াত বা বর্ণনার উপরে নির্ভর করেছেন। সঠিক পথ ঐ দু'য়ের মাঝখানে, যে পথ অনুসরণ করেছেন মুজতাহিদ ইমামগণ'।[৪২]

কাদিয়ানী বিজয়ী শেরে পাঞ্জাব মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃ.) উপরোক্ত আলোচনার জওয়াবে বলেন,

اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ مرسل حدیث کو ضعیف نہیں کہتے خلافاً للجمہور- مودودی صاحب اوپر میں امام مالک اور شافعی کے بارے میں جو دعوی کیا ہے وہ بالکل غلط ہے- کیونکہ وہ لوگ ضرور کسی حدیث کو بلاسند صحیح نہیں کہتے تھے اور حدیث ہی کو وہ لوگ حجت جانتے- لیث کے بارے میں جو دعوی کیا وہ بہی غلط ہے- اگر اصرار ہے تو دو چار مسائل پیش کرنا ہے-

---

৪১. তাফহীমাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৭৯ খৃ.) ১/৩৬০-৬১ পৃ.।
৪২. তাফহীমাত ১/৩৬০ পৃ.।

Contents

'আসল কথা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) 'মুরসাল' হাদীছকে যঈফ বলতেন না, যা সকলের বিরুদ্ধ মত। ইমাম মালেক ও শাফেঈ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা একেবারেই ভুল। কেননা তাঁরা নিশ্চয়ই কোন হাদীছকে বিনা সনদে ছহীহ বলতেন না। আর হাদীছকেই তারা দলীল জানতেন। লাইছ বিন সা'দ সম্পর্কে ৭০টি মাসআলার ব্যাপারে যে দাবী করা হয়েছে, সেটাও ভুল। যদি যিদ করা হয়, তাহ'লে দু'চারটে মাসআলা পেশ করা হউক'।[৪৩]

উপরের আলোচনায় হাদীছের বর্ণনার উপরে মুজতাহিদ ইমামগণের রায়কে যদি তা ছহীহ হাদীছ বিরোধীও হয়, তবুও তাকে সঠিক পথ বলা হয়েছে। অথচ মুজতাহিদগণের অবস্থা এই যে, তাঁদের পরস্পরের মতভেদে ফিক্বহের কিতাবসমূহ ভরপুর। খোদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সমস্ত ফৎওয়ার দুই তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (১৩১ হি.-১৮৯ হি.)। যেমন ইমাম গাযালী (রহঃ) স্বীয় 'কিতাবুল মানখূলে' বলেন, أَنَّهُمَا خَالَفَا أَبَا حَنِيفَةَ فِى ثُلُثَىْ مَذْهَبِـــهِ- 'তাঁরা দু'জন আবু হানীফার দুই তৃতীয়াংশ মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন'।[৪৪]

অমনিভাবে আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (৭২৭-৭৭১ হি.) বলেন, فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُوْلَ صَاحِبِهِمَا- 'শুধু মাসায়েল বিষয়েই নয়, বরং ফিক্বহী মূলনীতিতেও উক্ত শিষ্যদ্বয় তাদের উস্তাদের বিরোধিতা করেছেন '।[৪৫]

এবারে আসুন স্বয়ং ইমাম ছাহেবের কথা শুনি। তিনি স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফকে বলেন, لاَ تَرْوِ عَنِّى شَيْئًا فَإِنِّى وَاللهِ مَا أَدْرِىْ مُخْطِئٌ أَنَا أَمْ مُصِيْبٌ؟

---

৪৩. পাঞ্জাবের অমৃতসর হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ হ'তে ৩০শে নভেম্বর '৪৫ পর্যন্ত ১১ কিস্তিতে সমাপ্ত বিরাট প্রবন্ধের সমষ্টি, -'খেতাব' ৪র্থ কিস্তি ১৩ পৃ. দ্রষ্টব্য।

৪৪. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী কৃত 'শরহ বেক্বায়াহ্র ভূমিকা' পৃ. ৮ শেষ লাইন (দিল্লী ছাপা ১৩২৭ হি.); ঐ, (দেউবন্দ, মাকতাবা থানবী, তাবি) পৃ. ঐ।

৪৫. তাজুদ্দীন আবু নছর আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি./১২৮৪-১৩৫৫ খৃ.), তাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/২৪৩ পৃ.।

'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌র কসম আমি জানি না আমি নিজ সিদ্ধান্তে বেঠিক না সঠিক'।[৪৬]

তিনি আরও বলেন,

وَيْكَ يَا يَعْقُوْبُ! لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّى فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَ أَرَى الرَّأْىَ غَدًا وَ أَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

'সাবধান হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে তুমি যা-ই শুনো তাই-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজ যে রায় দেই, কাল তা পরিত্যাগ করি। কাল যে রায় দেই পরশু তা প্রত্যাহার করি।' ইমাম খতীব বাগদাদী অবিচ্ছিন্ন সনদে একথা রেওয়ায়াত করেছেন।[৪৭] বরং ইমাম আবু হানীফা সহ প্রসিদ্ধ চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا 'যখন হাদীছ ছহীহ পাবে, জেনো সেটাই আমাদের মাযহাব'।[৪৮]

যারা হাদীছের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে ফক্বীহ ও মুজতাহিদগণের রায়ের উপর নির্ভরশীল হতে চান, তাদের জন্য উপরোক্ত আলোচনাটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করি। তবুও এখানে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি উক্তি উপহার দিতে চাই। তিনি বলেন, لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ- 'যদি দ্বীন রায় অনুযায়ী হ'ত তাহ'লে মোযার নীচে মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত মোযার উপরে মাসাহ করার চেয়ে'।[৪৯]

পরিশেষে ঐ সকল ভাইদেরকে নিম্নের কয়েকটি আয়াতের দিকে নযর দিতে বলি।-

---

৪৬. খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.), 'তারীখু বাগদাদ' (মিসর : সা'আদাহ প্রেস ১৩৪৯/১৯৩১ খৃ.) ১৩/৪০২ পৃ. ১১ লাইন।
৪৭. তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃ. ৮ম লাইন।
৪৮. শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১/৭৩ পৃ. ১১ লাইন।
৪৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (কায়রো ছাপা) ১/১৭৭ পৃ.; আবুদাঊদ হা/১৬২, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫২৫ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'মোযার উপর মাসাহ' অনুচ্ছেদ।

(১) সূরা হিজ্‌র ৯ম আয়াত, যেখানে আল্লাহ বলছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী'।

(২) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ– لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْم بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ– 'নিশ্চয়ই যারা কুরআন আসার পর তাকে অস্বীকার করে, (তারা কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে)। বস্তুতঃ এটি অবশ্যই একটি মহিমময় গ্রন্থ' *(৪১)*। 'এতে মিথ্যার কোন প্রবেশাধিকার নেই, না সম্মুখ থেকে না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪১-৪২)*। অর্থাৎ সম্মুখ থেকে কাফের-মুশরিকরা এবং পিছন থেকে ফাসিক-মুনাফিকরা এর শব্দে বা মর্মে মিথ্যা কিছু ঢুকাতে পারবে না বা কোনরূপ পরিবর্তন করতে পারবে না।

(৩) রাসূলুল্লাহ*(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* কুরআন মুখস্থ করতে যখন ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন, তখন নাযিল হ'ল, لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ– إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ– فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ– ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ– 'তাড়াতাড়ি 'অহি' আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না' *(১৬)*। 'নিশ্চয়ই অহি সংরক্ষণ ও তা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের' *(১৭)*। 'যখন (জিব্রীলের মাধ্যমে) আমরা কুরআন পাঠ করাব, তখন তুমি তার পিছে পিছে পাঠ করবে মাত্র' *(১৮)*। 'অতঃপর ওটাকে (তোমার মাধ্যমে) ব্যাখ্যা করানোর দায়িত্বও আমাদের' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ– 'আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে এবং (এটি নাযিল করেছি) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত হিসাবে' *(নাহল ১৬/৬৪)*। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ দু'টিই আল্লাহ্‌র 'অহি'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীন সংক্রান্ত সকল কথাই যে আল্লাহ্‌র 'অহি' সে বিষয়ে (৪) আল্লাহ বলেন, –وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى 'তিনি নিজের ইচ্ছামত (দ্বীনের ব্যাপারে) কোন কথা বলেন না' *(৩)*। 'যা কিছু বলেন, তা আল্লাহ্‌র অহি ব্যতীত নয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।[৫০]

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলি একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপর। তিনি তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মাধ্যমে অভ্রান্ত সত্যের এ দুই উৎসের হেফাযত করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস এর জাজ্বল্যমান সাক্ষী। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা কুরআনের হাফেয ছিলেন, একটি হরফও তাদের স্মৃতিতে হেরফের হয়নি। পরবর্তীকালে হাদীছের হাফেযগণ যে অনুপম স্মৃতিশক্তির আধার ছিলেন, তা ছিল সর্বকালের ইতিহাসে বিস্ময়কর। যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান বলছে তিন লক্ষ শব্দের বেশী স্মৃতিতে ধারণ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।[৫১] সেখানে রাবীদের নাম, সনদ ও হাদীছের মূল বর্ণনা সহ ছয় লক্ষ, সাত লক্ষ এমনকি দশ লক্ষ হাদীছের সনদ ও মতন হুবহু মুখস্থ রাখা অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আর কি হতে পারে? ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দেছীনের চেয়ে স্মৃতিধর কোন পুরুষ তাঁদের আগেও ছিলেন না, এযাবত হয়নি। আর পরে যদি কোন কালে হয়ও, তবুও তাকে দিয়ে তো আর হাদীছের হিফ্‌য বা যাচাই-বাছাইয়ের খিদমত হবে না।

---

৫০. হাদীছ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কখনো জিব্রীল নিজে এসে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন (ক) হেরা গুহায় জিব্রীল সরাসরি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বুকে চেপে ধরে নুযূলে অহি-র সূচনা করেন *(বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১; তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা সূরা 'আলাক্ব দ্রষ্টব্য)*। (খ) কা'বা চত্বরে রাসূলকে দু'দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া *(আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; মিশকাত হা/৫৮৩)*। (গ) ছাহাবীগণের মজলিসে এসে মানুষের বেশ ধরে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া *(মুসলিম হা/৮; নাসাঈ হা/৪৯৯১; মিশকাত হা/২)*। (ঘ) খানাপিনা নিয়ে আসা অবস্থায় খাদীজা (রাঃ)-কে জিব্রীল রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে ও নিজের পক্ষ হ'তে সালাম দেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১৭৬)*। (ঙ) মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর কুরায়েশদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য আল্লাহ সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে বায়তুল মুক্বাদ্দাস তুলে ধরেন *(বুখারী হা/৩৮৮৬; মুসলিম হা/১৭০, ১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬-৬৭)*। এধরনের অসংখ্য নযীর রয়েছে।

৫১. জোগাবাঈ, নয়াদিল্লী-২৫ হ'তে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'আত-তাও'ইয়াহ' আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ২৭।

এ কথা বলা হয়তবা অযৌক্তিক হবে না, যাঁরা হাদীছের উপর সন্দেহারোপ করেন, তাঁরা প্রকারান্তরে কুরআনের উপরেও সন্দেহারোপ করেন। কেননা কুরআন যাঁরা হিফ্য করেছিলেন, হাদীছও তাঁরাই হিফ্য করেছেন। একই ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আমরা অহিয়ে মাত্লু (কুরআন) ও অহিয়ে গায়র মাত্লু (হাদীছ) লাভ করেছি। এমতাবস্থায় চৌদ্দশ' বছর পরে এসে হাদীছের উপরে সন্দেহবাদ আরোপকারী পণ্ডিতদেরকে করুণা করা ভিন্ন আমাদের মত সাধারণ মুসলমানদের আর কি-ইবা করার থাকে? ট্রাজেডী এই যে, যাঁরা সুন্নাহ্তে সন্দেহ করেন, তাঁরাই আবার দেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন চালু করার জন্য দিন-রাত গলদঘর্ম হচ্ছেন। অথচ মেনে চলেন দলীয় ফিক্বহ। আমরা এই সকল যুক্তিবাদীদের নিকট হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী ফারূকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি দ্ব্যর্থহীন উক্তি পেশ করে ক্ষান্ত হ'তে চাই। তিনি বলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ مَا قَبَضَ اللهُ رُوْحَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَفَعَ الْوَحْيَ عَنْهُ حَتَّى أَغْنَىَ أُمَّتَهُ كُلَّهُمْ عَنِ الرَّأْيِ– 'যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি এবং অহি উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তাঁর উম্মত সকল প্রকার যুক্তিবাদ হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে'।[৫২]

১১. ইবাদত ও ইত্বা'আত (العبادة والإطاعة) :

ইবাদত ও ইত্বা'আত তথা উপাসনা ও আনুগত্য সম্পর্কে এই দর্শন আর এক অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করেছে। এই দর্শন আল্লাহ্র ইবাদত ও সরকারের আনুগত্যকে এক করে দেখেছে। বরং এর মতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনই হ'ল মূল ইবাদত। আর সেই ইবাদতের লক্ষ্যেই সকল কাজ করতে হবে। নইলে সব কিছুই ব্যর্থ হবে। যেমন বলা হচ্ছে,

یہ جملہ عبادات جو صرف ذرائع کی حیثیت میں ہیں گر اصول قیام حکومت کے واحد نصب العین سے علیحدہ ہو کر کام کرتے ہیں تو عند اللہ ان کا کوئی اجر نہ ہوگا-

৫২. শা'রানী, কিতাবুল মীযান, ১/৬২ পৃ. ১৮ লাইন।

'এই সকল ইবাদত যা কেবল মাধ্যম হিসাবে গণ্য হ'তে পারে, যদি হুকূমত কায়েমের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট এ সবের কোন ছওয়াব মিলবে না'।[৫৩]

বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। যদি আপনার ছালাত-ছিয়ামের পিছনে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা না থাকে, তাহ'লে ঐ ছালাত-ছিয়ামে কোন ছওয়াব নেই। এ কারণেই তো এই দর্শনের অনুসারীগণ সুন্নাত-বিদ'আত এমনকি শিরকের প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, এসব ছোট-খাট বিষয় ছাড়েন, মূল কথা হ'ল আপনি ইক্বামতে দ্বীনের (?) জন্য কি করছেন বা কত টাকা আমাদের এয়ানত দিচ্ছেন সেটা বলুন। যেহেতু তাদের ধারণায় রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনই হ'ল মূল ইবাদত। বাকী সবই এর ট্রেনিং কোর্স মাত্র। তাই যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতায় যাওয়াই এদের প্রধান লক্ষ্য। ইসলামকে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করতে চান।

উপরোক্ত দর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে এই যে, যে সব আলেম ও বিদ্বান রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত নন, বরং ওসব হ'তে দূরে থেকে দারস-তাদরীস বা অন্যান্য ধর্মীয় খিদমতে রত আছেন, তাঁরা এদের ধারণায় ইক্বামতে দ্বীনের কাজ করছেন না (?) বলে এই দর্শনের অনুসারী লোকদের নিন্দাবাদের শিকার হচ্ছেন। এমনকি মতবিরোধের কারণে কোন কোন সময় হত্যাযোগ্য অপরাধী হিসাবেও বিবেচিত হচ্ছেন। এদের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু জীবনও গিয়েছে।[৫৪]

ইবাদত ও ইত্বা'আত-এর পার্থক্য (الفرق بين العبادة والإطاعة) :

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْعِبَادَةُ هِيَ غَايَةُ الذُّلِّ لِلّٰهِ بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهُ– 'আল্লাহ্র জন্য চরম বিনয়ের মাধ্যমে চরম ভক্তি প্রকাশ করাকে

---

৫৩. তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন ২৪ পৃ. ও রোয়েদাদ ৩য় খণ্ড ৩২ পৃ.-এর বরাতে হাকীম আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ খান, 'ইসতিফসার' শ্রীনগর (কাশ্মীর ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৯ মোট পৃ. ২৪) ৮ পৃ. ৩য় লাইন।

৫৪. সবশেষে এদের প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ' বা 'জেএমবি' নামক জঙ্গী সংগঠন ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট দেশের ৬৩টি যেলা শহরে একদিনে একযোগে বোমা হামলা করে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের বিরোধীদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। এদের পৃষ্ঠপোষক সে সময়ের কথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার দীন লেখক সহ বিরোধী মতের বহু আলেম-ওলামা ও নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং নানাবিধ অত্যাচার চালায়।

ইবাদত বলা হয়'।[৫৫] আর ইত্ত্বা'আত অর্থ আনুগত্য। ইত্ত্বা'আত ও ইবাদত-এর মধ্যে আম-খাছ সম্পর্ক। ইত্ত্বা'আত বা আনুগত্য আল্লাহ ও বান্দা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ইবাদত বা উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। সূরা মু'মিনূন ৪৭ আয়াতে হযরত মূসা ও হারূণ সম্পর্কে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ যে – وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ (তাদের কওম আমাদের দাসত্বকারী) বলেছে, সেখানে 'ইবাদত' তার মূল (হাক্বীক্বী) অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং রূপক অর্থে (মাজাযী) ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীছে ইহূদী-নাছারাদের তাদের পোপ-পাদ্রীদের প্রতি অন্ধ তাক্বলীদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ (ওটাই তাদের ইবাদত হ'ল) বলে যা বলা হয়েছে, সেটাও ভাবার্থে। নইলে মানুষ যে কখনও আল্লাহ্র আসনে বসতে পারেনা, সে কথা সবাই জানেন। এক্ষণে পিতার আনুগত্য, নেতার আনুগত্য, শিক্ষকের আনুগত্য, সরকারের আনুগত্য, সব কিছুকে যদি আল্লাহ্র আনুগত্য বা ইবাদতের সঙ্গে এক করে দেখা হয়, তাহ'লে তো পরোক্ষভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য সকলকেও মা'বূদের আসনে বসানো হয়। যা পরিষ্কারভাবে শিরক। যেমন বলা হয়েছে,

پرستش دراصل بندگی کی فرع ہے اور اپنی عین فطرت کے اقتضاء سے اپنی اصل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے- جب انسان اپنے جہل اور بے خبری کی بناپر فرع کو اصل سے جدا کرتا ہے، بندگی ایک کی کرتا ہے اور پرستش دوسرے کی، تو یہ تفریق سراسر فطرت کے خلاف واقع ہوتی ہے،...بخلاف اسکے جب نادانی کا پردہ درمیان سے اٹھ جاتا ہے، انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ معبود وہی ہے جو مالک اور خالق اور پروردگار ہے، تو بندگی اور پرستش دونوں یکجا ہو جاتی ہے- فرع اصل سے مل جاتی ہے- بیٹی اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ جاتی ہے-

'উপাসনা মূলতঃ আনুগত্যের শাখা। যা স্বাভাবিক তাকীদেই তার মূলের সাথে মিলে থাকতে চায়। মানুষ যখন স্বীয় মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে শাখাকে মূল

---

৫৫. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-'উবূদিইয়াহ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৭ম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.) ৪৮ পৃ.।

থেকে পৃথক করে ফেলে, আনুগত্য একজনের করে ও উপাসনা অন্যের করে, তখন এই পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ প্রমাণিত হয়...। এর বিপরীতে যখন অজ্ঞতার পর্দা মাঝখান থেকে উঠে যায়, মানুষের সেই বাস্তবতার জ্ঞান এসে যায় যে, উপাস্য তিনি, যিনি প্রভু, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা; তখন আনুগত্য ও উপাসনা দু'টো একত্রিত হয়ে যায়। শাখা তার মূলের সঙ্গে মিলে যায়। কন্যা তার মায়ের কোলে পৌঁছে যায়'।[৫৬]

ইবাদতের এই অভিনব ব্যাখ্যার দু'টি মারাত্মক ক্ষতির দিক রয়েছে। ১- সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক গণ্য হয়। যা অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শন। অথচ তাওহীদের আক্বীদা মতে বান্দা ও আল্লাহ্র সত্তা কখনোই এক নয়। ২- এর ফলে উপাসনা ও আনুগত্য একই সত্তার নিকট নিবেদন করতে হবে। এতে মানুষ মানুষকে পূজা করবে। যা তাওহীদের বিরোধী।

৩- উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে যে কোন গুনাহ্গার ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলতে হবে। কারণ ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত নফসের হুকুমে বা অন্য কারও হুকুমে গুনাহ করেছে। যা চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা। যাদের মতে কবীরা গোনাহগার মুমিন তওবা না করলে কাফের ও তার রক্ত হালাল। বিনা তওবায় মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

৪- রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই ব্যাখ্যার ফল দাঁড়াবে এই যে, ইসলামী সরকার ব্যতীত অন্য সরকারের আনুগত্য নিষিদ্ধ হবে। কেননা সেক্যুলার সরকার যদি মুসলিমও হয়, তথাপি তার রাজনৈতিক আনুগত্য যেহেতু আল্লাহ্র বদলে মানুষের নিকট থাকে, সেহেতু ঐ সরকার কাফির ও মুশরিক গণ্য হবে। তখন ঐ সরকারকে উৎখাত করাই মুমিনের সবচেয়ে বড় জিহাদ হিসাবে গণ্য হবে। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, যা রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। ইসলাম নিশ্চয়ই তা চায় না। এই দর্শনের অনুসারীরাই বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজি করে মুসলিম উম্মাহকে চরম পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে এদের হাতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সেই ইসলামী সরকারের বিরোধিতা করাও তাদের মতে শিরক ও কুফরী হিসাবে গণ্য হবে।

---

৫৬. তাফহীমাত ১/৬৩ পৃ.।

কেননা ইবাদত ও ইত্বা'আত যখন একই অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন ইসলামী সরকারের আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্য হিসাবে বিবেচিত হবে। ইসলামের নামে ইসলামী সরকারের যে কোন কাজই নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে। টুঁ শব্দটি করলেই আনুগত্যহীনতার দায়ে কাফির বা মুশরিক সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হবে। সেও অবশ্যম্ভাবীরূপে আরেক বিশৃংখলার জন্ম দিবে, যা কখনই ইসলামের কাম্য নয়। উমাইয়া, আব্বাসীয় ও তাদের পরবর্তী মুসলিম শাসকদের সময়ে হকপন্থী ওলামায়ে কেরামের উপরে বিশেষ করে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপর আপতিত নির্মম সরকারী নির্যাতন সমূহ আমাদেরকে বারবার উক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি ইবাদতকে আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইত্বা'আতকে অন্যের জন্য গণ্য করি, তাহ'লে সরকারকে কাফির-মুশরিক না বলেও আমরা তার আনুগত্য করতে পারি এবং তার বৈধ সমালোচনা করতে পারি।[৫৭]

১২. অন্ধ অহমিকা (التكبر الأعمى) :

এই দর্শন মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং এর অনুসারীদের মধ্যে এক অন্ধ অহমিকাবোধের জন্ম দিয়েছে। এই দর্শন চৌদ্দশ' বছর পরে এসে নিজেকে ইসলামের প্রকৃত ভাষ্যকার গণ্য করেছে এবং যারা এর অনুসারী হবেনা তাদেরকে 'ইহূদী' হবার দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে বলে ধমকি দিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسی کہ ہماری یہ دعوت ہے، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا
دے اور اس اس کو ایک بڑی سخت ازمائش میں ڈال دینا ہے ...یا تو اس کا ساتھ
خدمت کو انجام دینے کیلئے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض
ہے، یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم
اختیار کر چکی ہے- ایسی صورت میں ان دو راہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش

৫৭. এ মর্মে হাদীছ দ্রষ্টব্য : মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, রাবী উম্মে সালামাহ (রাঃ)।

Contents

-اس قوم کیلئے باقی نہی رہتی 'এই ধরনের একটি দাওয়াত যেমন আমাদের এই দাওয়াত, যখন কোন মুসলিম কওমের নিকট পেশ করা হয়, তখন তাদেরকে তা এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়। ...হয় তারা এর সঙ্গে যোগ দিয়ে এর খিদমতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে, যা মুসলিম উম্মাহ্কে সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য নতুবা দাওয়াত প্রত্যাখান করে সেই অবস্থা বরণ করবে, যা তাদের পূর্বে বরণ করেছিল (নবী যুগের) ইহূদীগণ। এক্ষণে এই দু'টি পথ ব্যতীত মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অন্য কোন পথ আর খোলা থাকে না'।[৫৮] কি কঠিন ধমকি!

সকলেই জানেন যে, ইরানের বাহাঈ ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লাহ ঈরানী (১৮১৭-১৮৯২ খৃ.) এবং পাঞ্জাবের কাদিয়ানী ফের্কার প্রতিষ্ঠাতা ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও (১৮৩৫-১৯০৮ খৃ.) এক সময় মুসলিম উম্মাহ্কে এই ধরনের ধমকি শুনিয়েছিলেন। এখন পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর এই ধমকি নাযিল হয়েছে। জানিনা তারা তা কবুল করে এই দর্শনের অনুসারী দলটির নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবার সার্টিফিকেট নিবেন, নাকি কবুল না করে ইহূদী হবার অভিশাপ কুড়াবেন?[৫৯]

---

৫৮. রোয়েদাদ (দিল্লী-৬; মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৮৩) ২/১৯ পৃ.।

৫৯. ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে উক্ত দর্শনের অনুসারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার জনৈক ছাত্র (পরে মান্দা, নওগাঁর একটি কলেজের শিক্ষক) দীন লেখককে এক পত্রে অত্যন্ত দরদের (?) সাথে বলেছিলেন 'দোয়া করি আপনি মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম হয়ে মরুন'! পরের বছর ১৯৮৫ সালের ৫ ও ৬ই নভেম্বর তাদের এলাকায় আমাদের সম্মেলনের কথা শুনে তিনি 'এলাকাবাসী' শিরোনামে ও অন্যান্যদের সাথে নিজ স্বাক্ষরে চিঠি লিখে লেখককে হুমকি দিয়ে বলেন, যদি আপনি আমাদের এলাকায় আসেন, তবে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে সাথে নিয়ে আপনাকে রুখে দেওয়া হবে'। কিন্তু তার এ হুমকি উপেক্ষা করে লেখক সেখানে যান এবং সেখানকার চকউলি হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী বিশাল ইসলামী সম্মেলনের ২য় দিন হুমকিদাতা স্টেজে বসা অবস্থায় আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণ দেন। সেখানে এক পর্যায়ে তিনি শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি কম্যুনিস্ট সরকার চান, না ইসলামী সরকার চান? সবাই বলল, ইসলামী সরকার চাই। অতঃপর প্রশ্ন করা হ'ল, আপনারা কি বুখারী-মুসলিম-তিরমিযীর ইসলাম চান, না হেদায়া-শরহ বেকায়া-কুদূরীর ইসলাম চান? সমস্ত ময়দান গর্জে উঠলো, আমরা হাদীছের ইসলাম চাই'। অতঃপর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল ময়দান- 'কুরআন-হাদীছ যেখানে, আমরা আছি সেখানে'। 'কুরআন-হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু মানিনা মানব না'। পরে দেখা গেল যে. হুমকিদাতা 'লেকচারার' তার দলবল নিয়ে চলে গেছেন। উল্লেখ্য যে, সেই সময় উক্ত এলাকায় কম্যুনিষ্ট ও মওদূদী আন্দোলন যোরদার ছিল।

১৩. ফেরেশতারা দেব-দেবীর ন্যায় (الملائكة كالأصنام) :

চরমপন্থী দর্শনের উক্ত দলটিতে যোগদান না করলে তাকে ইহূদী হবার ধমক দেওয়ার পর উক্ত দর্শন এবার মুসলমানদের ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ ফেরেশতাদের সম্পর্কে এক অভিনব কথা শুনিয়েছে। যেমন বলা হচ্ছে,

اسلامی عقیدۃ میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان ویونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے-

'ইসলামী আক্বীদায় যাকে ফেরেশতা বলা হয়, তা সম্ভবতঃ ঐ বস্তু, যাকে হিন্দুস্তান ও ইউরোপ প্রভৃতি দেশে মুশরিকরা দেব-দেবী বলে থাকে'।[৬০]

জাহেলী আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদের 'আল্লাহ্র কন্যা' বলত *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪০; তূর ৫২/৩৯ প্রভৃতি)*। এযুগের কথিত মুজাদ্দিদগণ ফেরেশতাদের দেব-দেবী তথা নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের বলে রায় দিলেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। বস্তুতঃ ফেরেশতা বিষয়ে আক্বীদা বিনষ্ট হলে পুরা নবুঅত ও রিসালাত বাতিল প্রমাণিত হবে। কেননা জিব্রীল ফেরেশতাই 'অহি' বহন করে আনেন। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُوْنَ– 'ফেরেশতাগণকে আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তারা তাই করে' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

১৪. আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (عقيدة ضالة فى عبادة الله) :

এই দর্শনের উর্বর মস্তিষ্ক মুসলমানদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কে উদ্ভট ধারণা প্রদান করেছে। যেমন,

انسان خواہ خدا کا قائل ہو یا منکر، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر خدا کی،... چاہے وہ اپنے اختیار سے کسی اور کی پوجا کر رہا ہو...طوعاً و کرہاً

৬০. তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন ১০ পৃ.; গৃহীত : দাঊদ রায, আক্বায়েদ ও আফকার; সংকলনে : হাকীম আজমাল খাঁ, ... কো পেহচানিয়ে (দরিয়াগঞ্জ, নয়াদিল্লী : দারুল কিতাব, ১৯৮৬ খৃ.) ১৫১ পৃ.।

-خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے 'মানুষ চাই আল্লাহতে বিশ্বাসী হৌক বা অবিশ্বাসী হৌক, আল্লাহকে সিজদা করুক বা পাথরকে সিজদা করুক... অথবা সে তার পসন্দমত অন্য যারই পূজা করুক, ...ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে আল্লাহ্রই ইবাদত করছে' *(তাফহীমাত ১/৫৩ পৃ.)*।

বেশ তাহ'লে তো মূর্তিপূজা ও কবরপূজাও আল্লাহ্র ইবাদত হবে! তাহ'লে শিরক ও নাস্তিক্যবাদ কাকে বলা হবে? রাসূল (ছাঃ) কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন কেন? কা'বাগৃহ সহ আরব এলাকার বড় বড় মূর্তিগুলো তিনি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন কেন?

১৫. ইবাদত ও মু'আমালাত (العبادة والمعاملة) :

জিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ- مَآ أُرِيْدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَن يُّطْعِمُوْنِ- إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ-

'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' *(৫৬)*। 'আমি তাদের থেকে কোন রূযী চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে' *(৫৭)*। 'নিশ্চয় আল্লাহই রূযীদাতা এবং প্রবল পরাক্রমশালী' *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে মানুষের সকল কাজ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইবাদত ও মু'আমালাত তথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী, ধর্মীয় ও বৈষয়িক। দু'ধরনের কাজে দু'ধরনের মূলনীতি রয়েছে। ইবাদত-এর মূলনীতি হ'ল 'তাওক্বীফী' যা অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র শরী'আতই কোন ইবাদত চালু করতে পারে। নিজেরা ধর্মের নামে কোন ইবাদত চালু করলে সেটা বিদ'আত হবে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

পক্ষান্তরে মু'আমালাত বা বৈষয়িক কাজ-কর্মের মূলনীতি হ'ল 'ইবাহাত'। অর্থাৎ এখানে বান্দা শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে সকল

প্রকার বৈধ কাজ করতে পারে। যেমন যায়েদ তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভাত-মাছ-গোশত-ডিম রাখবে, না রুটি-শাক-সবজী-ডাল রাখবে, সে বিষয়ে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবে। কেননা এগুলির সবই হালাল ও রুচিকর। শুধু খেয়াল রাখবে সে যেন হারাম ও অরুচিকর খাদ্য ভক্ষণ না করে। অমনিভাবে দেশের শাসক বা সরকার সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় কখন কোন আইন রচনা করা প্রয়োজন, তিনি তার বিজ্ঞ পারিষদবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে তা করবেন। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্র বদলে জনগণের কিংবা জনগণের নামে সরকারের কুক্ষিগত করতে পারবেন না। সূদের হারামকে হালাল করে অর্থনৈতিক বিধি-বিধান চালু করতে পারবে না। জুয়া-লটারী-মওজূদদারী-মুনাফাখোরী, বেপর্দা ও যেনা-ব্যভিচারীর প্রচলন ঘটাতে পারবে না। কারণ তা করলে শরী'আতের সীমা লংঘন করা হবে।

বলা বাহুল্য বৈষয়িক ব্যাপারে দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলার ফলে মুমিনের দুনিয়াবী কাজটিও ইবাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। যদিও দ্বীন দ্বীনই থাকে এবং দুনিয়া দুনিয়াই থাকে। যেমন গনগনে লোহাকে 'লোহাটি আগুন হয়ে গিয়েছে' বলা হয়। কিন্তু আসলে লোহা লোহাই থাকে, আগুন আগুনই থাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। সেটি হ'ল যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে স্রেফ দুনিয়া পায়, কিন্তু আখেরাত হারায়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই হারায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

কয়েকটি দলীল

(بعض الدلائل فى الدين هو غير السياسة)

আলোচ্য দর্শন মানুষের দুনিয়াবী জীবনকে ধর্মীয় জীবন গণ্য করেছে। অথচ ইসলামের নবী (ছাঃ) এর বিপরীত হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন- (১) রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* মদীনায় হিজরত করে দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ পুং খেজুরের ফুলের রেণু নিয়ে মাদী খেজুরের ফুলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তাতে খেজুরের ফলন ভাল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নিয়মটি পসন্দ করলেন না। ফলে লোকেরা এটা বাদ দিল। দেখা গেল যে, ফলন দারুণভাবে কমে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ– 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে দ্বীনের বিষয়ে কোন হুকুম দেব, তখন তোমরা সেটা অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু যখন আমি আমার রায় অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেব, তখন নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ মাত্র'।[৬১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ 'তোমরা তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক জ্ঞাত' *(মুসলিম হা/২৩৬৩)*।

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুক্তদাসী বারীরাহ তার স্বামী মুগীছ থেকে মুক্ত হ'তে চায়। বেচারা মুগীছ মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরাহকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কেঁদে বুক ভাসায়। দয়ার নবী এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে বারীরাহকে ডেকে বললেন, لَوْ رَاجَعْتِهِ 'আহ্! যদি তুমি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে'? বারীরাহ জওয়াবে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! أَتَأْمُرُنِى 'আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّمَا أَشْفَعُ 'না আমি মুগীছের জন্য তোমার নিকট সুফারিশ করছি মাত্র'। বারীরাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিল, لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ 'তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই'। বুঝা

৬১. মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

গেল নবীর উক্ত সুফারিশ রাসূল হিসাবে কোন দ্বীনী নির্দেশ ছিল না। নইলে তো বারীরাহকে অবশ্যই তা মেনে নিতে হ'ত। কিন্তু আসলে এ সুফারিশ ছিল একজন দরদী মানুষ হিসাবে, যা গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে বারীরাহ্র স্বাধীনতা ছিল। প্রকাশ থাকে যে, বারীরাহ্র এই ঘটনাটি বুখারী শরীফে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পঁচিশ জায়গায় এসেছে। বস্তুতঃ বারীরাহ তার স্বামী মুগীছ থেকে পৃথক হয়ে যায় (فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا)।[৬২]

(৩) বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের নিকট পরামর্শ নিতেন। এই পরামর্শ পুরোপুরি সমতার ভিত্তিতে হ'ত। কখনো নিজের মতে, কখনও ছাহাবায়ে কেরামের মতের উপরে সিদ্ধান্ত হ'ত। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মোট ২১টি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে হযরত ওমরের রায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।[৬৩]

তন্মধ্যে একটি হ'ল বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফিরদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে। হযরত ওমর (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয় কর্তৃক সকল শত্রুকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্যের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বলেন। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করে সবাইকে রক্তমূল্যের বিনিময়ে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু পরদিন আয়াত নাযিল করে আল্লাহ ওমরের রায়কে সমর্থন করলেন *(আনফাল ৮/৬৭)*।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ্র নবী ও হযরত আবুবকর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তবে সূরা আনফালের ৬৭ ও ৬৮ আয়াত দু'টি বন্দী বিনিময় চুক্তির পরের দিন নাযিল হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্র অশেষ করুণা নিহিত ছিল। যাতে চাচা আব্বাস ও বনু হাশেমসহ বহু হিতাকাংখী বন্দী মুক্তি পান। যারা শুরু থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর কল্যাণকামী ছিলেন এবং পরে প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যান। বস্তুতঃ এটি ছিল পরবর্তী যুদ্ধ সমূহের ব্যাপারে একটি স্থায়ী নির্দেশনা।

এ সকল ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার বৈষয়িক জীবনে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যতক্ষণ না সেটি শরী'আতের সীমা লংঘন করে।

---

৬২. বুখারী হা/৫২৮৩ 'তালাক' অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ; হা/২৭২৬ 'শর্তসমূহ' অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য; মিশকাত হা/৩১৯৯, 'বিবাহ' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী ৯/৩৬৮।

৬৩. তাক্বীউদ্দীন আল-মাক্বরীযী (মৃ. ৮৪৫ হি.), ইমতা'উল আসমা ১/৩৮০ পৃ.।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা (واقعة علمية)

ছিফফীন যুদ্ধে মীমাংসার জন্য হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয় পক্ষের দু'জনকে শালিশ নির্বাচন করেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ এটিকে 'কুফরী' ধারণা করে। তারা আলী ও মু'আবিয়া উভয়কে 'কাফির' (নাঊযুবিল্লাহ) গণ্য করে উভয়কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। আলী (রাঃ) তখন বাধ্য হয়ে এই দলত্যাগী তথা খারেজীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন ও তাদের নির্মূল করে দেন। এই সময়কার ঘটনায় হযরত আলীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) খারেজীদের নিকট গমন করেন ও তাদের মনোভাব পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা করেন। ইবনু আব্বাসের নিকট তখন খারেজীরা তিনটি অভিযোগ পেশ করে। -

১. আলী (রাঃ) কেন দ্বীনী বিষয়ে মানুষকে শালিশ নিযুক্ত করলেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

২. তিনি প্রতিপক্ষকে গালিও দেন না, তাদের সম্পদও লুট করেন না। যদি মু'আবিয়ার দল কাফির হয়, তবে তাদের মাল হালাল। আর যদি মুমিন হয়, তবে তাদের রক্ত হারাম।

৩. শালিশনামা লেখার সময় আলীকে 'আমীরুল মুমিনীন' (মুমিনদের নেতা) লেখা হয়নি। তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমীরুল কাফেরীন (কাফিরদের নেতা) হবেন।'

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছাহাবী ছিলেন। তিনি সংক্ষেপে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাদের প্রশ্নগুলির যে জওয়াব দিয়েছিলেন, তা আমাদের সবারই জন্য শিক্ষণীয়। জওয়াবগুলি ছিল নিম্নরূপ :

১. যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রাণী শিকার করে, তাহ'লে তাকে অনুরূপ একটি প্রাণী বদলা দিতে হবে। প্রাণীটি পূর্বের প্রাণীর অনুরূপ কি-না, তা যাচাইয়ের জন্য দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ লোককে মধ্যস্থ মানতে হবে। এই

Contents

মর্মে আল্লাহ বলেন, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ‘আর সামঞ্জস্য নির্ধারণের বিষয়টি ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্যকার দু’জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি’ *(মায়েদাহ ৫/৯৫)*।

অমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হ’লে দু’পক্ষের দু’জনকে শালিশ নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا، ‘আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ’লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে শালিশ নিযুক্ত কর’ *(নিসা ৪/৩৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত দু’টি আয়াতের বরাত দিয়ে খারেজীদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলেন, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা একটি ছোট্ট খরগোশ যার মূল্য সিকি দিরহামও নয়, তার জন্য শালিশ নিয়োগ করার চাইতে মুসলমানদের জান-মালের হেফাযতের জন্য একটি বৈষয়িক ব্যাপারে উভয়পক্ষে শালিশ নিয়োগ করা কি অধিকতর যুক্তি সংগত নয়? তারা বলল, হ্যাঁ।

২. তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, তোমরা কি তাহ’লে মা আয়েশাকেও (যিনি হযরত আলীর বিরুদ্ধে ‘উটের যুদ্ধে’ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) গালি দিবে? তাঁকেও কি কাফের বলবে? তারা ভুল স্বীকার করল।

৩. তোমরা কি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে দেখোনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দ কেটে দিয়ে সন্ধিপত্রে শুধুমাত্র ‘মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ’ লিখতে হযরত আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

খারেজীরা তাদের ভুল স্বীকার করল এবং বিশ হাযার লোক তওবা করে ফিরে এল। মাত্র চার হাযার রয়ে গেল। যারা নাহরাওয়ান যুদ্ধে হতাহত হ’ল।[৬৪]

---

৬৪. হাফেয মীর মুহাম্মাদ ইব্রাহীম শিয়ালকোটি (১২৯১-১৩৭৫ হি./১৮৭৪-১৯৫৬ খৃ.), তারীখে আহলেহাদীছ (ওখলা, নয়াদিল্লী-২৫, মাকতাবাতুত তাওহীদ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩) পৃ. ৪৬-৪৮, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৮; গৃহীত : ফাওয়াতেহুর রাহমূত (গাযালীর ‘মুসতাছফা’ সহ) ২/৩৮৮ পৃ.; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৫৯৮; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৮৬৭৮ প্রভৃতি।

উপরোক্ত ঘটনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম রাজনৈতিক বিষয়কে ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে টেনে আনেননি। তাঁদের যা বিবাদ রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপারেই ছিল, ধর্মীয় ব্যাপারে নয়। আর রাজনৈতিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে মতবিরোধ এমনকি পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে কেউ কাউকে 'কাফির' বলতেন না। মরলে 'শহীদ' বাঁচলে 'গাযী' হবার গৌরব করতেন না। সাবাঈ, শী'আ, খারেজী এই ধরনের কিছু লোক রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি করেছিল মাত্র। আজও কিছু লোক সে ফিৎনার মধ্যে রয়েছে।

এক নযরে তিনটি মতবাদ

(النظريات الثلاثة فى لمحة)

১ম মতবাদ, তাক্বলীদ (التقليد الأعمى) :

হিজরী চতুর্থ শতকে প্রচলিত এই মতবাদটি ধর্মের নামে মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করেছে। মুসলিম বিদ্বানদের জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করেছে। মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন বিদ্বানের নামে বিভিন্ন দল ও উপদলে (মাযহাবে ও তরীকায়) বিভক্ত করেছে। মুসলমানদের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তি বিনষ্ট করেছে। মুসলিম জনসাধারণকে নিঃশর্তভাবে কুরআন ও হাদীছের বিধান মানার বদলে নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহের অনুসারী হ'তে বাধ্য করেছে। ফলে তাক্বলীদ বজায় রেখে কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসরণ যেমন অসম্ভব হয়েছে, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কায়েম করাও তেমনি নিছক কল্পনা বিলাসে পরিণত হয়েছে।

২য় মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (فصل الدين عن الدولة) :

এই মতবাদ দ্বীনকে দুনিয়াবী জীবন থেকে পৃথক করতে চেয়েছে এবং মানুষের বৈষয়িক ব্যাপারে ইসলামের কোন হেদায়াত নেই বলে বিশ্বাস করেছে, যা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে ব্যক্তি জীবনে একজন সৎ ও দ্বীনদার মুসলমানও নিজেকে বা নিজের দেশকে পরিচালনার জন্য হাসিমুখে ইসলাম বিরোধী মতবাদসমূহ কবুল করে নেয়। এইভাবে নিজের অজান্তেই সে বিদেশীদের কলুর বলদে পরিণত হয়।

৩য় মতবাদ, ধর্মই রাজনীতি (الدين هو السياسة) :

এই মতবাদ মানুষের পুরো জীবনকে ধর্মীয় জীবন হিসাবে গণ্য করেছে। এই মতবাদ দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে দ্বীনকে ব্যবহার করেছে এবং প্রথমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তার মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতে চেয়েছে। যা কেবল নবীদের তরীকা বিরোধী নয় বরং দুনিয়ার সকল আদর্শিক বিপ্লবের নিয়ম বিরোধী। অতি যুক্তিবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে এই দর্শন ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহবাদ আরোপ করেছে ও তাকে কার্যতঃ ব্যর্থ সাব্যস্ত করেছে।

মধ্যপন্থা

(الطريق الأوسط)

উপরের তিনটি চরমপন্থী মতবাদ আলোচনা শেষে এক্ষণে মধ্যপন্থা বের করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। একজন প্রকৃত মুমিন যদি আলেম হন, তাহ'লে নিজে কুরআন-হাদীছ দেখে জীবন গড়বেন। আর যদি জাহিল হন, বা কোন বিষয় না জানা থাকে, তাহ'লে নিরপেক্ষ, যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের নিকট থেকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান জেনে নিবেন। কখনই কোন অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট মাযহাবী ফৎওয়া বা ব্যক্তির রায় তলব করবেন না। তাহ'লে তিনি ১ম মতবাদের সংকীর্ণতা হ'তে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের জীবন, পরিবার ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

একজন মুমিন নিশ্চয়ই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবেই বিশ্বাস করবেন। তিনি ধর্মীয় জীবনে তো বটেই, বৈষয়িক জীবনেও ইসলামের দেওয়া হুদূদ বা সীমারেখা পুরোপুরি মেনে চলবেন। আর এভাবেই তিনি ২য় মতবাদের খপপর হ'তে মুক্তি পেয়ে সার্বিক জীবনে পূর্ণ মুমিন হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

একজন মুমিন অবশ্যই দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রে গুলিয়ে ফেলবেন না। তিনি কোন অবস্থাতেই দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহার করবেন না। বরং দুনিয়াকে দুনিয়া গণ্য করেই তাকে দ্বীনের রং-য়ে রঞ্জিত করতে চেষ্টা করবেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই রায় বা যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দিবেন না এবং আক্বীদা ও বিধানগত ব্যাখ্যায় কখনই ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত তরীকার বাইরে যাবেন না। তাহ'লেই তিনি ৩য় মতবাদের বাড়াবাড়ি হ'তে রেহাই পাবেন।

অতঃপর একজন মধ্যপন্থী মুসলমান যখন যে অবস্থায় থাকুন না কেন, নিজেকে সর্বাবস্থায় নির্ভেজাল সৎ ও দ্বীনদার হিসাবেই প্রমাণিত করবেন। দ্বীনের লক্ষ্যে তিনি দুনিয়াকে কুরবানী দিবেন এবং কোন অবস্থাতেই দুনিয়ার

জন্য দ্বীনকে বিক্রি করবেন না। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্বীনকেই তিনি দ্বীন হিসাবে গণ্য করবেন। কারো রায় ও কেয়াস নয়, বরং আল্লাহ্‌র 'অহি'কে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবেন। তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বিশ্বাস করবেন এবং জীবনের যে শাখার সঙ্গে তিনি জড়িত হবেন, সেই শাখাতে ইসলামের বিধান সমূহ মেনে চলবেন। তিনি সর্বদা বাতিলের উপরে হক-এর বিজয় ঘটাতে চেষ্টিত থাকবেন। তিনি সর্বাবস্থায় দ্বীনদারগণের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকবেন এবং অন্যদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিয়ে যাবেন।

যদি ইসলামী খেলাফত কায়েম থাকে, তাহ'লে সেখানে তিনি বিদ্রোহ ছড়াবেন না। বরং সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন ও সরকারকে সুপরামর্শ দিবেন। পক্ষান্তরে যদি খেলাফত কায়েম না থাকে, তাহ'লে সরকারের হক সরকারকে দিবেন এবং দেশে ইসলামী খেলাফত কায়েমের জন্য নবীদের তরীকায় যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

Contents

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায়

(طريق إقامة الخلافة الإسلامية)

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র ইবাদত করা, অর্থাৎ সার্বিক জীবনে তাঁর দাসত্ব করা। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হ'ল পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে যাতে আল্লাহ্র ইবাদত সহজতর হয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন মুসলমান তার ব্যক্তি জীবনে স্বাধীন থাকলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সে অনৈসলামী আইনে শাসিত হয় এবং মানুষের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিংবা সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অনুসরণের ফলে মুমিনের রূযী হারাম রূযীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়। আর এ সকল কারণেই একজন মুমিনকে সর্বদা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকতে হয়। এক্ষণে ইসলামী খেলাফত কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার উপায়গুলি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। - বস্তুগত ও নৈতিক।

১. বস্তুগত উপাদান সমূহ (الأسباب المادية) : এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন-

(ক) ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা : আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَّلاَ تَفَرَّقُوْا، 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেতভাবে আঁকড়িয়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

(খ) ঝগড়া পরিহার করা : আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا، 'আপোষে ঝগড়া করো না, তাহ'লে হিম্মত হারিয়ে ফেলবে এবং তেজ উবে যাবে। আর তোমরা ছবর কর' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

(গ) অলসতা পরিত্যাগ করা : আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِيْنَ– 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

(ঘ) নেতার প্রতি অনুগত থাকা : আল্লাহ বলেন,

أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

(ঙ) দৃঢ়পদে সংগ্রাম করা : আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا، 'হে বিশ্বাসীগণ! লড়াইয়ের সময় দৃঢ় থাক' *(আনফাল ৮/৪৫)*।

(চ) শক্তি অর্জন করা : আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ–

'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা সাধ্যপক্ষে শক্তি সঞ্চয় কর, ঘোড়া ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে। এর দ্বারা তোমরা ভয় দেখাও আল্লাহ্‌র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের এবং তাদের বাইরে অন্যদের, যাদের তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদের জানেন। আর যা তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে, তা পুরোপুরি তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবেনা' *(আনফাল ৮/৬০)*।

২. নৈতিক উপাদান সমূহ (الأسباب المعنوية) :

(ক) ধৈর্যশীলতা ও (খ) আল্লাহভীরুতা : আল্লাহ বলেন,

إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ–

‘যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীরু থাক, তবে ওরা তোমাদের দিকে অতর্কিতে এগিয়ে এলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সাহায্য করবেন পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা’ *(আলে ইমরান ৩/১২৫)*।

(গ) দৃঢ়চিত্ততা : আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةُ، ‘নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয়’ *(হা-মীম সাজ্দাহ ৪১/৩০)*।

(ঘ) ঈমান ও (ঙ) সৎকর্মশীলতা : আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،

‘আল্লাহ তা‘আলা ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যকার ঐ সব লোকদের যারা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে। তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন’ *(নূর ২৪/৫৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবে ইসলামী খেলাফত কায়েমের পিছনে উপরোক্ত দু’টি কারণ বিদ্যমান ছিল। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্র মতে ‘তৎকালীন আরবরা একটি বিজয়ী শক্তির গুণাবলীতে ভূষিত ছিল’। বস্তুগত উপাদানে তারা অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নৈতিকতার মান তাদের নীচু ছিল। তাদের মধ্যে বে-ঈমানী, চরিত্রহীনতা ও দলাদলি ছিল। কিন্তু এসব ত্রুটিগুলি পরে ইসলামের বরকতে বিদূরিত হয়ে গেলে তারা পরস্পরে সহযোগী হয়ে যায়।

এইভাবে বস্তুগত ও নৈতিক উপাদানে বলীয়ান হওয়ার পরেই আল্লাহ পাক তাদের উপরে পুরস্কার অথবা পরীক্ষা স্বরূপ ইসলামী খেলাফত পরিচালনার গুরুভার ন্যস্ত করেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

উপরে বর্ণিত দু’টি উপাদান অর্জিত হওয়ার সাথে সাথে বাড়তি আরেকটি কারণ ঐ সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সেটি হ’ল ঐ সময়ে জগতে নেতৃত্ব দানকারী শক্তিগুলি তাদের নৈতিক বল হারিয়ে ফেলেছিল এবং জনসাধারণ তাদের

ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়েছিল। সেকারণ মানুষ ইসলামী খেলাফতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৬৫]

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক ও বস্তুগত উভয়বিধ উপাদান অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্তুগত উপাদানে দু'টি শক্তি সমান হ'লে সে ক্ষেত্রে নৈতিক শক্তিতে অধিকতর বলীয়ান দলটিই জয়লাভ করবে। সূরা নূর-এর ৫৫ আয়াতে 'ঈমান' ও 'আমলে ছালেহ'-কে খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মনে করেন শুধুমাত্র দো'আর মাধ্যমেই দেশে ইসলামী হুকূমত কায়েম হয়ে যাবে অথবা যারা ভাবেন ক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই কেবল ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এরা উভয়েই ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন। বরং যে দেশে আমরা ইসলামী আইন জারী করতে চাই, সে দেশের জনগণের মন-মানসিকতাকে আগে নির্ভেজাল ইসলামী ছাঁচে গড়ে নিতে হবে। ইসলামের প্রকৃত বুঝ হাছিল হয়ে গেলে তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামী খেলাফত হবে ইনশাআল্লাহ।

বলাবাহুল্য উপরের এই নিয়মটি কেবল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং অন্যান্য আদর্শবাদী রাষ্ট্রের বেলায়ও এ নিয়মের বাস্তবতা দেখা গিয়েছে। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চীনা বিপ্লব সব কিছুর পূর্বে একদল নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদীকে আমরা দেখেছি বছরের পর বছর ধরে নিরলসভাবে সে সব দেশের জনগণের মন-মগয তৈরী করতে। এভাবে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমেই রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ তার পুরাতন আদল পাল্টিয়ে আদর্শিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। ধর্ম ও আদর্শ প্রচারের স্বাধীনতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তিগুলি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ও ধর্মের মিঠা বুলি শুনিয়ে তারা গরীব জন সাধারণকে ধর্মান্তরিত করছে। অতঃপর জনসংখ্যা কিছু বাড়লে

---

৬৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ গোন্দলবী (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান) কৃত 'তানক্বীদুল মাসায়েল' বই।

তাদের জন্য আলাদা একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ অথবা স্বাধীন ভূখণ্ড দাবী করছে।[৬৬]

অন্যদিকে তারা এদেশের মুসলিম তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদেরকে আদর্শচ্যুত করে চলেছে। উদ্দেশ্য একটাই, এদেশীয় সেবাদাসদের মাধ্যমে নতুন কায়দায় বিদেশী শাসন-শোষণ কায়েম করা। লেবাননে মুসলিম-খৃষ্টান দ্বন্দ্ব, শ্রীলঙ্কায় সিংহলী-তামিল দ্বন্দ্ব, আফগানিস্তানে মুজাহিদ ও বিদেশী যুদ্ধ এরই প্রমাণ বহন করে। অমনিভাবে এদেশীয় তরুণদের মুখে ও দেওয়ালের ভাষায় বিদেশী আদর্শের পরস্পর বিরোধী শ্লোগান ও তাদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি পরিষ্কারভাবে বিদেশী গোলামীর স্বাক্ষর বহন করে।

এমতাবস্থায় আমরা যদি নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে আমাদের দাওয়াতী ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা যোরদার না করি, তাহ'লে এমন দিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা আমাদের দেশেই বিদেশী কারাগারে বন্দী হব কিংবা নিজেদের ভাইদের হাতে বিদেশী বন্দুকের খোরাক হব। যেমনটি আমরা এখন আমাদের নির্বাচিত এমপিদের মাধ্যমে বিদেশীদের চালুকৃত অনৈসলামী আইনে শাসিত হচ্ছি।

৬৬. ইন্দোনেশিয়ার ‘পূর্ব তিমুর’ যার বাস্তব প্রমাণ। সাহায্য দানের মুখোশে গরীব মুসলমানদের খৃষ্টান বানিয়ে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উসকে দিয়ে অবশেষে ২০শে মে ২০০২ সালে এ প্রদেশটিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক স্বাধীন ‘রাষ্ট্র’ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকার দক্ষিণ সূদানকে খৃষ্টান বানিয়ে তারা ২০০২ সালে পৃথক রাষ্ট্র বানিয়েছে। একইভাবে আধিপত্যবাদী শক্তিটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ১৯৮৯ সালের প্রথম ভাগে তারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক ‘বঙ্গভূমি’ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়েছিল।

দর্শনটির ছন্দপতন (تغيير النظرية)

১৯৪০-এর শেষদিকে এই তৃতীয় মতবাদটি জাতিকে কিছু বিপ্লবী কথা শুনিয়েছিল। যদিও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে এগুলিকে পাকিস্তান বিরোধিতার পক্ষে কিছু যুক্তির অবতারণা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। আমরা রাজনীতির আলোকে বিচার না করে কথাগুলিকে কেবল মতবাদ হিসেবেই উপলব্ধি করতে চাই। যেমন বলা হচ্ছে,

‘ইসলামী রাষ্ট্রও তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন কোরআনের আদর্শ ও মতবাদ এবং নবী মোস্তফার চরিত্র ও কার্যকলাপের বুনিয়াদে কোন গণ-আন্দোলন জাগিয়া উঠিবে- আর সমাজ জীবনের সমগ্র মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদকে একটি প্রবলতর সংগ্রামের সাহায্যে একেবারে আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে’।

আর একটু এগিয়ে যেয়ে বলা হচ্ছে, ‘উপরে আমাদের বর্তমান জাতীয় চরিত্রের যে চিত্র অংকিত হইয়াছে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া অনায়াসেই বলা যায় যে, তাহাদের ২৫/৫০ লক্ষ লোকের বিরাট ভীড় অপেক্ষা এই ধরণের ১০জন মাত্র বিপ্লবী কর্মী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অধিকতর কৃতিত্ব ও সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে পারে।’ আরও বলা হয়েছে, ‘গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে দেশের ভোটদাতাদের মনোনীত ও নির্বাচিত লোকদের হাতেই অর্পিত হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব; কিন্তু ভোটদাতাদের মধ্যে যদি ইসলামী মতবাদ, ইসলামী স্বভাব-চরিত্র ও দৃষ্টিভংগী এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত না হয়, ...তাহা হইলে তাহাদের ভোটে কখনই ‘প্রকৃত মুসলিম’ ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবে না’।[৬৭]

কিন্তু শীঘ্রই রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম পরিবর্তন ঘটলো এবং পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। তখন ১৯৪৭-এর গোড়ার দিকের এক রচনায়

---

৬৭. ইসলামী বিপ্লবের পথ, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (ঢাকা: ১ম সংস্করণ ১৯৫৪) ১৯, ২৩ ও ২৭ পৃ.। বইটি ১৯৪০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচি হলে ‘আঞ্জুমানে ইসলামী তারীখ ও তামাদ্দুন’-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। বিষয়বস্তু ছিল, ‘ইসলামী হুকূমত কিস তরহ কায়েম হোতী হ্যায়’ -দ্র. ঐ অনুবাদকের কথা। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪।

ভবিষ্যতের কল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রের আইন তৈরীর ক্ষেত্রে 'ফেকাহ শাস্ত্রে মতবিরোধের অভিযোগ'-এর জওয়াবে ইতিপূর্বে ১৯৪০-এ ছুঁড়ে ফেলা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বহু বিঘোষিত 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এই থিওরীকে ডাস্টবিন থেকে তুলে এনে ইসলামী আইনের নামে প্রচলিত মাযহাবী আইন রচনার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হ'ল এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাকে কেবল বক্তৃতায় চমক সৃষ্টির জন্য ষ্টেজে রেখে দেওয়া হ'ল। যেমন বলা হয়েছে,

'ফেকাহ্র মতবিরোধ যা আছে, তা সবই বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা, কেয়াস ও ইজতেহাদী সমস্যার ব্যাপারে'।[৬৮] কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কেননা (হানাফী) ফিক্বহের মধ্যে এমন বহু মাসায়েল রয়েছে, কুরআন বা হাদীছে যার কোন অস্তিত্ব নেই। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর সাক্ষ্য শ্রবণ করুন এবং আপাততঃ পঞ্চাশটি মাসআলা নমুনা স্বরূপ দেখুন।[৬৯] আর এটা জানা কথা যে, যেসব ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দলীল পাওয়া সম্ভব, যে সব ক্ষেত্রে ইজতেহাদ অচল। এরপরে বলা হয়েছে, 'কোনো আলেম যদি শরীয়তের বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করেন, কোনো ইমাম যদি স্বীয় ইজতেহাদ ও কেয়াসের বলে কোন সমস্যার সমাধান করেন কিংবা কোনো মুজতাহিদ যদি ইসতেহসানের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান করেন, তা সাথে সাথেই ইসলামী রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয় না। মূলতঃ তার ধরণ হচ্ছে একটি প্রস্তাবের মতোই। আইনে পরিণত হয় তখন, যখন তার ওপর যুগের ফকীহদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তাদের অধিকাংশ তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন এবং তার ওপরই ফতোয়া প্রদত্ব হয়' *(পূর্বোক্ত পৃ. ৩৭)*।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই দর্শন মাত্র কিছুদিন যেতে না যেতেই তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং আর পাঁচটি

---

৬৮. ইসলামী আইন কি ও কেন? অনুবাদ : মুনির উদ্দীন আহমদ, শিরোনাম : ফেকাহ শাস্ত্রে মতবিরোধের অভিযোগ (প্রকাশক : রূপসা পাবলিকেশন্স, ৩০ সিমেট্রী রোড, খুলনা, তাবি) পৃ. ৩৬। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬।

৬৯. মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১ খৃ.) তরীক্বে মুহাম্মাদী (করাচী-৬; মাকতাবা মুহাম্মাদিয়া, তাবি) পৃ. ১৩৬-১৫৪; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০। আরও দেখুন, মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিয়ালকোটি, আযযাফরুল মুবীন (লাহোর : উর্দূ বাযার, মাকতাবা মুহাম্মাদিয়া, ৫ম সংস্করণ ২০১৪) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দু'খণ্ড একত্রে ৫২২ পৃ.।

পাশ্চাত্যপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের ন্যায় ‘মেজরিটির’ পূজারী হয়ে পড়ে। অন্যান্য দল তাদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা কেউ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে। সেইভাবে উপরোক্ত দর্শনের অনুসারী দলটি ইসলামকে বেছে নেয়। ১৯৬৪-এর নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে একই কাতারে থেকে এই দলটি ইসলামী নীতির বাইরে গিয়ে বয়সোত্তীর্ণ একজন সম্মানিতা মহিলাকে পাকিস্তানের ‘প্রেসিডেন্ট’ হিসাবে সমর্থন দেয়। দুর্ভাগ্য এই যে, অন্যান্য দল তাদের আপোষে মারামারি-কাটাকাটিকে রাজনৈতিক ব্যাপার হিসাবে গণ্য করলেও এই দলটি কিন্তু সরকারী যুলুম-নির্যাতন ও অন্যান্য দলের হাতে মার খাওয়াকে নিজের ‘হক’ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে প্রচার করতে থাকে। নিজেদের মিছিলগুলিকে জিহাদের মিছিল এবং নিজেদের নিহত লোকদেরকে ‘শহীদ’ হিসাবে চালিয়ে দিতে থাকে। অথচ মুসলমানের হাতে মুসলমান মরলে সে ‘শহীদ’ হিসাবে গণ্য হয় না।[৭০]

এই দর্শনের অনুসারীগণ কয়েক বৎসর ‘অরাজনৈতিক’ থাকার পর নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৫৬ সালে সমগ্র দেশে যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হ’তে চলেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ একদিন এই দলটির মাননীয় দার্শনিক নেতা পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী লোকসংখ্যা বেশী, সেহেতু এদেশে ‘হানাফী ফিকহ’ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে’।[৭১]

ব্যস! অখণ্ড জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। ইসলামী শাসনতন্ত্র তার প্রতিষ্ঠার দোরগোড়া হ’তে ফিরে গেল। ঠিক একই অবস্থা হয়েছে বর্তমান পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের আমলে (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ হ’তে ১৭ আগস্ট ১৯৮৮)। সেখানে প্রেসিডেন্টের আবেদন ক্রমে অন্যান্য দলের ন্যায়

---

৭০. لَيْسَ فِى الْإِسْلَامِ شَهَادَةٌ وَلَكِنَّهَا النُّدَبَاءُ আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাহ ১/২৩১ পৃ. ১৮ লাইন। বয়সোত্তীর্ণ উক্ত অবিবাহিতা মহিলা ছিলেন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃ.)-এর ছোট বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ (১৮৯৩-১৯৬৭ খৃ.)।

৭১. সাপ্তাহিক ‘আল-ই‘তিছাম’ লাহোর, ৩৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৮৪; ৩৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা; সাপ্তাহিক ‘আল-ইসলাম’ লাহোর, ১৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৭ই নভেম্বর ১৯৮৬।

ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডাবাহী উক্ত দর্শনের অন্ধ অনুসারী দলটি সরকারের নিকট যে 'শরী'আত বিল' পেশ করে, তাতে ১৯৫৬ সালের সেই প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। কয়েকটি ধারা সম্বলিত উক্ত খসড়া 'শরী'আত বিল'-এর ২(খ) ধারায় চিরাচরিত নিয়মানুসারে কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী আইনের মূল উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ৮ম ধারায় গিয়ে বলা হয়,

مسلّمہ اسلامی فرقوں کے شخصی معاملات ان کے اپنے فقہی مسلک کے مطابق طے کئے جائینگے-

'গৃহীত ইসলামী ফের্কাগুলির ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর সমাধান তাদের নিজেদের মাযহাবী ফিক্বহ অনুযায়ী করা হবে'।[৭২] সে দেশের 'সম্মিলিত সুন্নী পরিষদ' (متحدہ سنی محاذ) পাকিস্তানে হানাফী ফিক্বহ (فقہ حنفی) চালু না করলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে বলে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেয়'। তারা বলে, باکستان میں فقہ حنفی کو نافذ کیا جائے- دیگر فرقوں پر سنل لاء میں بے شک رعایت دی جائے- مگر ملک کا قانون ایک ہو- اس کے بغیر ملک کی سلامتی اور ملت کی وحدت قائم نہیں ہو سکے گی- 'পাকিস্তানে হানাফী ফিক্বহ চালু করতে হবে। অন্যান্য ফের্কা সমূহকে তাদের ব্যক্তিগত আইন সমূহে (Personal Law) অবশ্যই ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু দেশের আইন একটাই হবে। এটা ব্যতীত দেশের নিরাপত্তা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে না'।[৭৩]

জুলাই '৮৫-তে উক্ত ৮ম ধারা সম্বলিত খসড়া 'শরী'আত বিল' (شریعت بل) পেশ করার পর শী'আ মতাবলম্বীরা তাদের অনুসরণীয় 'জাফরী ফিক্বহ' (فقہ جعفری) রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসাবে চালু করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী

৭২. পাক্ষিক মাজাল্লা আহলেহাদীছ (হরিয়ানা, ভারত) ২১শে জুলাই সংখ্যা ১৯৮৫ খৃ.।
৭৩. সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' লাহোর ৩৭ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা, ১৩ পৃ.; ২৯শে নভেম্বর ১৯৮৫; দৈনিক 'নাওয়ায়ে ওয়াক্ত' ৫ই মে ১৯৮৫।

তোলে। এছাড়াও খোদ হানাফী মাযহাব প্রধানতঃ ব্রেলভী ও দেউবন্দী দু'দলে বিভক্ত। এরপরও রয়েছে বিভিন্ন তরীকার বিভিন্ন নিয়ম-কানূন। বিল পেশকারী দলটি নিজেও একটি ফিরকা। তার রয়েছে নিজস্ব দর্শন ও চিন্তাধারা। হানাফী ফিক্বহের অনুসারী হ'লেও খোদ হানাফী মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ এই দলের বাইরে রয়ে গেছেন। কেউ ঢুকে বেরিয়ে এসেছেন। এমনকি স্বগোত্রীয় কেউ কেউ এই দলটিকে 'খারেজী' বলেছেন এবং নিজ নিজ অনুসারীদেরকে এই দলের সংস্পর্শে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।[৭৪] এক্ষণে দেশে 'গৃহীত ইসলামী ফের্কা'র সংখ্যা যে কতটি, তা নির্ধারণ করাও রীতিমত একটি গবেষণার বিষয় বৈ-কি!

পাকিস্তানী সহযোগীদের সুরে সুর মিলিয়ে উক্ত দর্শনের অনুসারী বাংলাদেশী দলটির আমীর সকল রাখ-ঢাক ছেড়ে ১৯৮৬-এর গোড়ার দিকে নিজেদের দলীয় মুখপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে একই কথা শুনিয়ে দিয়েছেন এবং এখনও বিভিন্ন সাংগঠনিক বৈঠকে তিনি বা তাঁর কর্মীরা উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ছাফাই গেয়ে চলেছেন। বক্তব্যটি নিম্নরূপ:[৭৫]

প্রশ্নঃ যে দেশে বিভিন্ন মাযহাবের লোক বাস করে, সে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কোন মাযহাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে?

জবাব : দেশে যে মাযহাবের লোকসংখ্যা বেশী সে মাযহাব অনুযায়ী সেখানে শাসন ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিবাহ, তালাক, ফারায়েজ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে প্রত্যেক মাযহাবের যার যার মাযহাব অনুযায়ী জীবন যাপন করার শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা থাকবে। চার মাযহাবের আহলে হাদীস, যেহেতু সুন্নাত আল-জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য তাদের মধ্যে খুব কম বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবু যার যার মাযহাব অনুযায়ী বিচার ফায়সালার সুযোগ আদালতে থাকবে'।

---

৭৪. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (১৮৯২-১৯৭৭ খৃ.) একে 'খারেজী' আন্দোলন বলেছেন। মাওলানা হোসায়েন আহমাদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭ খৃ.), মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (১৮১০-১৮৭৯ খৃ.), মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (১৮৯২-১৯৬১ খৃ.) একে 'হানাফী' বলে স্বীকার করেননি। দ্র. মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ঢাকা (অধুনালুপ্ত) ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ/ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ খৃ., ১৪৭-৪৮ পৃ. (পিডিএফ ৪৫ পৃ.)।

৭৫. ঢাকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৮৬ 'প্রশ্নোত্তরের আসর' উত্তরদাতা : আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম (১৯২২-২০১৪ খৃ.)।

'৫৬, '৮৫ এবং '৮৬-এর বক্তব্যগুলিতে কি চমৎকার মিল! একেই তো বলে 'হাতীর বাইরের দু'টি দাঁত দেখানোর জন্য, আর ভিতরের দু'টি দাঁত চিবানোর জন্য'। শ্লোগানের সময় বলা হয়, 'সব সমস্যার সমাধান আল-কুরআন, আল-কুরআন'। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ের সমাধান দিতে কুরআন ও সুন্নাহ কি অপারগ হ'ল? হায়রে তাক্বলীদ! হায়রে মাযহাব! এদের তো উচিত ছিল মহামতি ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। ফিক্বহী মতপার্থক্যের অজুহাত দেখিয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা খলীফা মানছূর (১৩৬-১৫৮ হি.) যখন 'মালেকী ফিক্বহ'কে রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসাবে চালু করার জন্য স্বয়ং ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, তখন ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) পরিষ্কারভাবে খলীফা মানছূর ও পরবর্তীতে খলীফা হারূনুর রশীদের (১৭০-১৯৩ হি.) অনুরূপ প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[৭৬] বলাবাহুল্য অমিত শক্তিধর খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মানছূর ও হারূণ এই ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন।

উত্তরদাতা জগাখিচুড়ী উত্তর দিয়েছেন। তিনি 'চার মাযহাবের আহলেহাদীস' বলতে কি বুঝিয়েছেন, তিনিই ভাল জানেন। তবে বিদ্বানগণের নিকট এটি পরিষ্কার যে, চার মাযহাবের ইমামদের মাযহাব ও আহলেহাদীছের মাযহাব একই। কিন্তু চার ইমামের নামে পরবর্তীতে মাযহাবী ফক্বীহদের রচিত ফৎওয়া সমূহের অধিকাংশ বরং সবটাই নিজেদের মনগড়া। তার সাথে চার ইমামের কোন সম্পর্ক নেই। আর আহলেহাদীছের আক্বীদা ও আমল একেবারেই পরিচ্ছন্ন। আর তা হ'ল ছহীহ হাদীছই তাদের মাযহাব। ফলে হাযারো শিরক ও বিদ'আতে পূর্ণ এদেশে প্রচলিত মাযহাব ও তরীকার লোকদের সাথে আহলেহাদীছের আক্বীদা ও আমলে তথা মূলে ও শাখা-প্রশাখায় সর্বত্র মতভেদ রয়েছে। ফলে কথিত ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতে যার যার মাযহাব অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করতে আদালত আদৌ সমর্থ হবে না। যদিনা স্ব স্ব ফিক্বহ ও তরীকা বাদ দিয়ে স্রেফ কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে হাদীছ অনুযায়ী ফায়ছালা না দেওয়া হয়।

---

৭৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, কায়রো ছাপা, ১/১৪৫ পৃ.।

আমরা বুঝতে পারিনা, যে দেশের মুসলমান এখনও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। যারা গর্ব করে বলে 'আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে পাক্কা মুসলমান', যে দেশের অধিকাংশ মুসলমান বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা ভুল-শুদ্ধ রেওয়াজকেই সঠিক ইসলাম ভাবতে অভ্যস্ত, যে দেশ ইসলামের নামে রকমারি শিরক ও বিদ'আতে ভরা, সে দেশের ভোটারদের মাধ্যমে রেওয়াজী ইসলাম ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকৃত ইসলাম কায়েম হওয়া কেমনে সম্ভব? বন্ধুরা বোধ হয় সে কারণেই লাজ-লজ্জা ছেড়ে আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা তো একটা থেকেই যাচ্ছে। সেটা হ'ল গৃহীত দুই ইসলামী ফের্কার দু'জন মুসলমানের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া হ'লে এবং তাদের অনুসরণীয় ফিক্বহী সিদ্ধান্ত দু'রকমের হ'লে ইসলামের নামে পরিকল্পিত সেই 'মাযহাবী রাষ্ট্রে'র বিজ্ঞ বিচারক কোন পক্ষে রায় দিবেন? যদি দু'পক্ষকেই সঠিক বলেন, তাহ'লে ঝগড়া মিটবে কিসের ভিত্তিতে? এর সমাধান তো পবিত্র কুরআনে বহু পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ، 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরে যাও' *(নিসা ৪/৫৯)*। বুঝা গেল ঝগড়া মীমাংসার ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ, কোন মাযহাবী ফিক্বহ নয়। যিনি যে দলেই থাকুন না কেন, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র সিদ্ধান্ত তাকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি হ'ল সেটাই এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাওয়াতও সেটাই। আমরা বলব, সত্যিকারের বিপ্লবী ও আদর্শবাদী যারা হবেন, তাঁরা কখনই সংখ্যাপূজারী হবেন না, বরং সত্যপূজারী হবেন। আল্লাহ বলেন, وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، 'আর তুমি লোকদের ভয় পাও, অথচ আল্লাহ বড় হকদার তাকে ভয় পাবার জন্য' *(আহযাব ৩৩/৩৭)*। অথচ প্রচলিত গণতন্ত্রে স্রেফ মাথা গণনা করা হয়, মগয পরিমাপ করা হয় না।

উপসংহার (الخاتمة)

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, জিন-ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা। আমাদের সার্বিক জীবনে নির্বিঘ্ন পরিবেশে সেই দাসত্বের প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই প্রয়োজন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের মূল লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্‌র ইবাদত প্রতিষ্ঠা, হুকূমত প্রতিষ্ঠা নয়। আমাদেরকে সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। বিগত যুগের কোন শাসন শক্তি যেহেতু নিরংকুশভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্বকে মেনে নেয়নি, সেকারণ তাদের সঙ্গে নবীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমানেও যারা সেই নিরংকুশ ইবাদতের ডাক দিবেন, নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানাবেন, ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত হেদায়াত অনুসরণের দাওয়াত দিবেন, তাদেরকেও এ যুগের বুদ্ধিজীবী, সমাজনেতা, ধর্মনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতেই হবে। এ বাধাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে নবীদের রেখে যাওয়া পবিত্র মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে প্রকৃত 'জিহাদ'। আর এই জিহাদে যারা শরীক হবেন, তারা বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও 'শহীদ' হিসাবে গণ্য হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،... 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হ'ল, সে ব্যক্তি শহীদ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল, সে ব্যক্তি শহীদ'...।[৭৭]

ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি মতবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকে সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে কথা, কলম ও সংগঠন এই ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে আমাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের স্বচ্ছ আলো নিয়ে জাহেলিয়াতের নিকষ কালো আঁধারের বুক চিরে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনে আমাদের প্রিয়তম সবকিছুকে উৎসর্গ করতে হবে। তবেই আমাদের

---

৭৭. মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আসুন! আমরা অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রেরিত অহিয়ে মাত্‌লু ও গায়ের মাত্‌লু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঘুণে ধরা সমাজকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে একদল নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ আল্লাহ্‌র নামে প্রস্তুত হয়ে যাই। সত্যসেবীদের একটি জামা'আত তৈরী হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ- (التوبة ١١٩)-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

অন্ধ ব্যক্তিপূজা, ধর্মহীন রাজনীতি এবং ধর্মই রাজনীতি-
এই তিনটিই চরমপন্থী মতবাদ। আসুন! এসব থেকে
বিরত হই এবং জীবনের চলার পথে আমরা ছিরাতে
মুস্তাক্বীমের অনুসারী হই!!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك-

اللهم اغفرلي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

*****

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনুঃ (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনুঃ (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।